তফসীরে জালালাইন

একটি সমীক্ষা

সঞ্চয়নে ঃ-
আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা ১
মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে মৌলিক নীতিমালা ৪
মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দলীল বিষয়ক নীতিমালা ১০
মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির উপরে আছেন ১১
মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত ২০
আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো ২২
মহান আল্লাহর মুখমন্ডল ২৪
মহান আল্লাহর হাত ২৮
মহান আল্লাহর পদনালী ৩৬
মহান আল্লাহর ইচ্ছা ৩৮
মহান আল্লাহর রহমত ৩৮
মহান আল্লাহর ভালবাসা ৪১
মহান আল্লাহর বাণী ও কুরআন ৪৩
মহান আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ ৫১
মহান আল্লাহর লজ্জাবোধ ৫৫
মহান আল্লাহর দেখা ৫৭
মহান আল্লাহ যাহের ও বাতেন ৫৮
মহান আল্লাহর রাগ ও ক্রোধ ৫৮
মহান আল্লাহর কৌশল, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র ৬০
মহান আল্লাহর আসা ৬৩
মহান আল্লাহর ফুৎকার করা ৬৫
প্রশস্ত অর্থকে সংকীর্ণ বা সীমিত করা ৬৬
কতিপয় বেঠিক ব্যাখ্যার নমুনা ১০১
ইসরাঈলী বর্ণনা ও ভিত্তিহীন কিছু কেচ্ছা-কাহিনী ১৩৯
পরিশিষ্ট ১৫৩

অবতরণিকা

إِنَّ الْحَمْدَ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَـهُ، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّـداً عَبْـدُهُ وَرَسُـوْلُهُ. ﴿يَـا أَيُّهَـا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَـامَ ، إِنَّ اللهَ كَـانَ عَلَـيْكُمْ رَقِيْباً﴾ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِـهِ وَلاَ تَمُـوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْـتُمْ مُـسْلِمُوْنَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً، يُّصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً﴾

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهـدي هـدي محمـد ﷺ، وشـر الأمـور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكـل بدعـة ضـلالة، وكـل ضـلالة في النـار، أمـا بعد:

তফসীরে জালাইনের লেখক আসলে দু'জন। আর দু'জনেরই উপাধি হল 'জালালুদ্দীন'। তাই তফসীরটির নাম 'জালালাইন' হয়েছে এবং সেই নামেই তার প্রসিদ্ধি রয়েছে। সর্বপ্রথম জালালুদ্দীন মাহাল্লী মুহাম্মাদ বিন আহমাদ শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) আল-

কুরআনের সূরা কাহ্‌ফ থেকে শেষ পর্যন্ত সূরা ফাতিহা-সহ তফসীর করেন। তিনি সন ৮৬৪ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। অতঃপর তাঁর ছাত্র জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী আব্দুর রহমান বিন কামাল শাফেয়ী (রাহিমাহুল্লাহ) সূরা বাক্বারার প্রথম থেকে সূরা বনী ইসরাঈলের শেষ পর্যন্ত অভিন্ন পদ্ধতিতে তফসীর ক'রে সংক্ষিপ্ত তাফসীরুল কুরআনের পরিপূর্ণতা দান করেন। তাঁর ইন্তিকাল হয় সন ৯১১ হিজরীতে।

দুই আল্লামা কর্তৃক লিখিত এ তফসীর 'তফসীর-এ-জালালাইন' সংক্ষেপের উপরে বড় উপকারী তফসীর। তাই আমাদের দেশের উলামায়ে কেরাম এটিকে মাদ্রাসার পঠন-পাঠনের তালিকায় শামিল ক'রে নিয়মিত পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন।

এ তফসীরে মুফাস্‌সিরদ্বয়ের ভুল ধরার মতো ধৃষ্টতা আমি দেখাইনি। বরং যে তফসীর মাদ্রাসার ছাত্ররা অধ্যয়ন ক'রে আলেম হয় এবং সেখান থেকে বহু ভুল আক্বীদা মনের ভিতরে বদ্ধমূল ক'রে দাওয়াতী ময়দানে অবতরণ করে, তাদেরকেই সতর্ক করা মূল উদ্দেশ্য। বহু দিন থেকে এ দ্বীনী ওয়াজেব পালন করার নিয়ত থাকা সত্ত্বেও মানসিক নানা কারণে হয়ে উঠেনি। আজ সে ওয়াজেব পালন করতে পেরে নিজের মনকে হাল্কা করতে পেরেছি।

এতদ্‌সত্ত্বেও এ দাবী করা কঠিন যে, উক্ত তফসীরের সকল আপত্তিকর ত্রুটি চিহ্নিত করা শেষ হয়েছে।

এতে যে সকল ভুল-ত্রুটি রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হল,

১। এতে রয়েছে মহান আল্লাহর সিফাত-সংক্রান্ত আয়াতের আশআরী ফির্কার অপব্যাখ্যা।

২। এতে রয়েছে আম শব্দের খাস তফসীর, অর্থাৎ, ব্যাপকার্থবোধক শব্দের সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা।

৩। এতে রয়েছে ইসরাঈলী বর্ণনাভিত্তিক কিছু অমূলক কাহিনী।

প্রসিদ্ধ তফসীর-গ্রন্থসমূহ থেকে তাঁরা চয়ন ক'রে যেটা সঠিক মনে করেছেন, উল্লেখ করেছেন। মহান আল্লাহর কাছে আশা করি, তিনি তাঁদের সে সকল অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন।

আরব-বিশ্বের যে সকল উলামায়ে কেরাম উক্ত তফসীর-গ্রন্থের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন, তাঁদের শীর্ষে রয়েছেন শায়খ ইবনে উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ)। তিনি তাঁর তফসীর-দর্সে বহু জায়গায় আপত্তিকর তফসীরে বাক্-টীকা বিবৃত করেছেন।

তাঁদের মধ্যে অন্যতম শায়খ হলেন, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খামীস। তিনি তাঁর টীকা-পুস্তিকার নাম দিয়েছেন, 'আনওয়ারুল হিলালাইন, ফিত্-তা'আক্কুবাতি আলাল জালালাইন।'

তদনুরূপ সমীক্ষা লিখেছেন, শায়খ ডক্টর মুহাম্মাদ বিন লুতফী আস-স্বাব্বাগ। অবশ্য তিনি পুরো তফসীরটাই সংশোধিত আকারে নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়েছেন।

আমি তাঁদেরই রোপিত ফসল থেকে চয়ন ক'রে অত্র পুস্তিকা প্রকাশকরণে প্রয়াস লাভ করেছি। মহান আল্লাহ সকলকে ত্রুটিমুক্ত করুন, ত্রুটি স্বীকার করার তওফীক দান করুন এবং সকল ত্রুটির ময়লাকে তাঁর ক্ষমার পানি দিয়ে ধৌত করুন। (আমীন)

অত্র পুস্তিকা দ্বারা মাদ্রাসার মুদার্রিস-ছাত্র এবং পাঠক উপকৃত হলে শ্রম সার্থক হবে।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব

১৩/ ৪/ ১৪৩৮হিঃ, ১১/ ১/ ১৭খ্রিঃ

মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধে মৌলিক নীতিমালা

মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্বন্ধেও নিয়ম-নীতি রয়েছে, যা মেনে না চললে পদস্খলন ঘটা স্বাভাবিক। যেমন ঃ-

১। মহান আল্লাহর (ইতিবাচক ও নেতিবাচক) সমস্ত গুণাবলী প্রশংসনীয় ও ত্রুটিবিহীন। তাতে কোন প্রকার নিন্দা ও ত্রুটির লেশমাত্র থাকতে পারে না।

{لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}

অর্থাৎ, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য নিকৃষ্ট উদাহরণ। আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উৎকৃষ্টতম উদাহরণ এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা নাহল ৬০ আয়াত)*

অর্থাৎ, তাঁর প্রত্যেক গুণ সৃষ্টির গুণের তুলনায় মহত্তর। যেমন তাঁর জ্ঞান অপরিসীম, তাঁর শক্তি অতুলনীয়, তাঁর দানশীলতা দৃষ্টান্তবিহীন, অনুরূপ সকল গুণাবলী। অথবা এর অর্থ হল, তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা ইত্যাদি (তিনি সর্বগুণনিধি।) *(ফাতহুল ক্বাদীর)* অথবা নিকৃষ্ট উপমা বলতে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা, আর উৎকৃষ্টতম উপমা বলতে সর্বতোমুখী পরিপূর্ণতা সর্বদিক দিয়ে আল্লাহর জন্যই। *(ইবনে কাষীর)*

পক্ষান্তরে যে গুণ কখনো কখনো নিন্দনীয়, তা মহান আল্লাহর শানে শোভনীয় নয়। অবশ্য প্রশংসনীয় অর্থে তা দোষাবহ নয়। যেমন, কৌশল, চক্রান্ত, ধোঁকা, উপহাস ইত্যাদি। এগুলি নিন্দনীয় হলেও, অপরের মুকাবিলায় অথবা প্রতিশোধে যখন তা করা হয়, তখন তা প্রশংসনীয় হয় এই জন্য যে, বিরোধীর মুকাবিলায় জয়ী হওয়া যায়।

মহান আল্লাহর শানে এই শ্রেণীর গুণ প্রশংসনীয়ভাবেই বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

{وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (٥٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তারা ষড়যন্ত্র করল এবং আল্লাহও কৌশল প্রয়োগ করলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বোত্তম কৌশলী। *(আলে ইমরান ৫৪ আয়াত)*

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত ক'রে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

{إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا} (١٦) سورة الطارق

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে। এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। *(সূরা ত্বারিক্ব ১৫- ১৬ আয়াত)*

{وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ (١٤) اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (١٥)

অর্থাৎ, যখন তারা বিশ্বাসিগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস করেছি।' আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে উপহাস ক'রে থাকি।' আল্লাহ তাদের সাথে উপহাস করেন, আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন। (বাক্বারাহ ঃ ১৪- ১৫)

২। মহান আল্লাহর নামাবলী অপেক্ষা গুণাবলী অনেক ব্যাপক।

যেহেতু প্রত্যেক নামের মধ্যেই মহান আল্লাহর এক অথবা একাধিক গুণ আছে। তার উপর মহান আল্লাহর কর্মাবলীও এক একটি গুণ। তাঁর কর্মাবলীর কোন সীমা নেই, তেমনি তাঁর বাক্যাবলীরও কোন শেষ নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢٧) سورة لقمان

অর্থাৎ, পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা লুক্বমান ২৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহর কর্মগত গুণ যেমন ঃ আসা, অবতরণ করা, গ্রহণ করা, নেওয়া, পাকড়াও করা, কষ্ট পাওয়া, হাসা, অবাক হওয়া, কথা বলা ইত্যাদি।

৩। মহান আল্লাহর গুণাবলী দুই শ্রেণীর; ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

ইতিবাচক গুণাবলী তা-ই, যা তিনি নিজের কিতাবে অথবা রসূলের মুখে 'আছে' বলে ব্যক্ত করেছেন। সে সকল গুণাবলী পরিপূর্ণ প্রশংসনীয় গুণ, তাতে কোন প্রকার ত্রুটি বা নিন্দার লেশমাত্র নেই। যেমন ঃ তাঁর জীবন, জ্ঞান, শক্তি, আরশে আরোহণ, পৃথিবীর আকাশে অবতরণ, তাঁর মুখমণ্ডল, হাত ইত্যাদি।

এ সকল গুণ তাঁর প্রকৃতার্থেই তাঁর জন্য যেভাবে শোভনীয় সেইভাবে 'আছে' বলেই বিশ্বাস করতে হবে। যেহেতু এ বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যা নিজের জন্য 'আছে' বলেন, আমরা তাঁর জবাবে 'নেই' বলে এ কথা প্রকাশ করতে পারি না

যে, 'আল্লাহ তুমি জান না, আমরা জানি, ঐ গুণ তোমার নেই। তোমার ঐ গুণ থাকতে পারে না; কারণ তা সৃষ্টির!'

৪। ইতিবাচক গুণাবলী প্রশংনীয় পরিপূর্ণতামূলক গুণ। সুতরাং সে গুণ যত বেশী হবে এবং তার অর্থ যত ভিন্ন হবে, তত মহান আল্লাহর প্রশংসা ও পরিপূর্ণতা প্রকাশ পাবে। এই জন্য তাঁর নেতিবাচক গুণাবলীর তুলনায় ইতিবাচক গুণাবলী অনেক অনেক বেশী।

মহান আল্লাহর নেতিবাচক গুণ তা-ই, যা তাঁর 'নেই' বলে খন্ডন করা হয়েছে। আমাদেরকে তা 'নেই' বলেই বিশ্বাস করতে হবে এবং তাতেও মহান আল্লাহর প্রশংসা ও পরিপূর্ণতা ব্যক্ত হবে। যেমন ঃ-

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

{اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ} (٢٥٥) البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ! তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ}

অর্থাৎ, আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। *(সূরা ক্বাফ ৩৮ আয়াত)*

{قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ (١) اللّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} (٤)

অর্থাৎ, বল, তিনিই আল্লাহ একক (অদ্বিতীয়)। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

তাঁর কোন সন্তান নেই এবং তিনিও কারো সন্তান নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। *(সূরা ইখলাস)*

৫। মহান আল্লাহর ইতিবাচক গুণাবলী দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়; সত্তাগত গুণ এবং কর্মগত গুণ।

(ক) সত্তাগত বা সাত্ত্বিক গুণে তিনি পূর্বে গুণান্বিত ছিলেন, বর্তমানে আছেন এবং ভবিষ্যতে থাকবেন। যেমন, জ্ঞান, শক্তি, সম্মান, প্রবলতা, মুখমন্ডল, দুই হাত, দুই চোখ ইত্যাদি।

(খ) কর্মগত গুণ তাঁর ইচ্ছা ও এখতিয়ারভুক্ত। যেমন ঃ কথা বলা, দেখা, শোনা, সৃষ্টি করা, হিদায়াত করা, রুযী দান করা, জীবন-মৃত্যু দান করা প্রভৃতি।

৬। মহান আল্লাহর গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখার সময় তা কোন কাল্পনিক অথবা বাস্তবিক জিনিসের মত ভাবা যাবে না। কারণ তাঁর মত কোন কিছুই নেই; না বাস্তবে, না কল্পনায়। তিনি বলেন,

{لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

তার প্রকৃতত্ব জানার চেষ্টা করা বৃথা। যেহেতু যেমন মহান আল্লাহর সত্তা আমাদের জ্ঞানের বাইরে, তেমনি তাঁর সকল গুণাবলীর প্রকৃতত্বও আমাদের জ্ঞানের নাগালের বাইরে। তিনি বলেন,

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء}

অর্থাৎ, তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত আছেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

{يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا} (١١٠) سورة طه

অর্থাৎ, তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। কিন্তু ওরা জ্ঞান দ্বারা তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। *(ত্বাহাঃ ১১০)*

{هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} (٦٥) سورة مريم

অর্থাৎ, তুমি কি তাঁর সমনাম কাউকেও জান? *(মারয়্যামঃ ৬৫)*

৭। মহান আল্লাহর সকল গুণাবলী কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল-সাপেক্ষ। কারো জ্ঞান বা অনুমিতি দ্বারা তা প্রমাণ ও বর্ণনা করা যাবে না।

সুতরাং যা আছে বলে প্রমাণিত, তা আমাদেরকে বিনা কৈফিয়তে বিশ্বাস করতে হবে, যা নেই বলে প্রমাণিত, তা নেই বলেই বিশ্বাস করতে হবে এবং যা 'আছে' অথবা 'নেই' কিছু বলে প্রমাণিত নেই অর্থাৎ, কুরআন-হাদীস যে গুণের ব্যাপারে চুপ আছে, আমাদেরকেও সে বিষয়ে চুপ থাকতে হবে। তার ব্যাপারে 'আছে' অথবা 'নেই' বলা যাবে না। যেমন,

'তিনি অসীম, তিনি সীমা-পরিধির ঊর্ধ্বে।

তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সাজ-সরঞ্জাম নিরপেক্ষ।

অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না।' *(আক্বীদাহ ত্বাহাবিয়াহ)*

অথচ আমরা জানি যে, মহান আল্লাহ ঊর্ধ্বে আছেন এবং তিনি আরশে আছেন।

মহান আল্লাহ শোনেন, তাঁর السمع (শ্রবণশক্তি) আছে ---এ কথা প্রমাণিত; কিন্তু তাঁর الأذن (কান) আছে ---এ কথা প্রমাণিত নয়। সুতরাং কান আছে কি না, তা বলা যাবে না। বলা যাবে না যে, তিনি কান দ্বারা শোনেন অথবা কান ছাড়া শোনেন। বরং এসব বিষয়ে বলতে হবে, আল্লাহই ভাল জানেন। *('মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী' বই থেকে)*

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর দলীল বিষয়ক নীতিমালা

(১) কোন নাম বা গুণ কুরআন অথবা সহীহ হাদীসের প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত করা যাবে না।

(২) নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের প্রকাশ্য অর্থই বুঝতে হবে; তার অপব্যাখ্যা করা যাবে না। শব্দ শুনতেই যে অর্থের প্রতি আমাদের মস্তিষ্ক দৌড় দেয়, তাই হল তার প্রকাশ্য অর্থ, তাই আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ ঃ 'হাত' মানে শক্তি বা কবজা ইত্যাদি প্রায় সব ভাষাতেই ব্যবহার হয়। কিন্তু সেটা তার আসল ও প্রকাশ্য অর্থ নয়, সেটা তার রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ। মহান আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে রূপক বা আলঙ্কারিক অর্থ গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

(৩) নাম ও গুণ বিষয়ক শব্দের অর্থ এক হিসাবে আমাদের জানা। কিন্তু অন্য হিসাবে আমাদের অজানা। যেহেতু সে গুণের প্রকৃতত্ব ও কেমনত্ব আমাদের জ্ঞানের নাগালের বাইরে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء} (٢٥٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, যা তিনি ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, যদি কেউ আপনাকে প্রশ্ন করে, 'আল্লাহ কোথায়?'

আপনি বলুন, 'আকাশে।'

যদি বলে, 'আল্লাহ কেমন?'

আপনি বলুন, 'আল্লাহ কেমন তা তো বলা যাবে না। কারণ তিনি

তাঁর কেমনত্বের কথা বলেননি; বরং বলেছেন, তাঁর মত কোন কিছুই নেই। আর মানুষের জ্ঞান তাঁর কেমনত্বের নাগাল পেতে পারে না।'

যদি বলে, 'আল্লাহ কখন?'

আপনি বলুন, 'আল্লাহই প্রথম, তাঁর পূর্বে কিছু নেই। আর তিনিই শেষ, তাঁর পরে কিছু নেই।'

যদি বলে, 'আল্লাহ কয়জন?'

তাহলে আপনি বলুন, 'আল্লাহ এক। আল্লাহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি জন্ম দেননি, জন্ম নেনও নি। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।'

('মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী' বই থেকে)

মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির উপরে আছেন

মহান আল্লাহ আছেন উপরে, সকল সৃষ্টির উপরে, সাত আসমানের উপরে, আরশের উপরে। তাঁর জ্ঞান, দয়া ও দৃষ্টি সর্বময়, সর্বব্যাপী, সর্ববিস্তৃত। তাঁর যিক্‌র থাকে মু'মিনের অন্তরে। আরশে থেকে তিনি তাঁর জ্ঞান ও সাহায্য দ্বারা বান্দার সাথে থাকেন।

তাঁর সর্বত্র থাকা সম্ভব ও সত্যিই থাকা দু'টি পৃথক কথা। যে কোন বস্তুর মধ্যে তাঁকে কল্পনা ক'রে নিলেই তো তিনি তাতে বিরাজমান হন না। তাছাড়া তিনি যে স্রষ্টা, সৃষ্টির ভিতরে তাঁর অবস্থান কেন হবে?

যে আয়াতে মহান আল্লাহর বান্দার সাথে থাকার কথা বলা হয়েছে সেই আয়াতেই তাঁর আরশে থাকার কথা রয়েছে। তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমুন্নত হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। *(সূরা হাদীদ ৪ আয়াত)*

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীরের বিভিন্ন স্থানে মহান আল্লাহর উক্ত সিফাতের অপব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ} (٩) سورة الرعد

"অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সম্বন্ধে তিনি অবগত; তিনি সুমহান, সর্বোচ্চ।" (রা'দ ঃ ৯)

শেষোক্ত শব্দের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন,

المتعال على خلقه بالقهر.

অর্থাৎ, তিনি নিজ পরাক্রমশালীতা দ্বারা সৃষ্টির উচ্চে।

অথচ সঠিক হল এই যে, এটা তার একটি অর্থ। যেহেতু মহান আল্লাহ নিজ পরাক্রমশালীতা দ্বারা প্রত্যেক সৃষ্টির ঊর্ধ্বে, নিজ পরিপূর্ণতা দ্বারা সকল অসম্পূর্ণতা ও মন্দ থেকে প্রত্যেক সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং নিজ সত্তায় প্রত্যেক সৃষ্টির ঊর্ধ্বে। তিনভাবেই তিনি সকল সৃষ্টির উপরে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} (١) سورة الأعلى

"তুমি তোমার সর্বোচ্চ প্রতিপালকের নামে পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (আ'লা ঃ ১)

এর ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'তোমার প্রতিপালকের সিফাত।'

অথচ সঠিক এই যে, 'আল-আ'লা' মহান আল্লাহর অন্যতম নাম। যে নামের অর্থে প্রমাণ হয় যে, তিনি সকল সৃষ্টির উপরে, সকলভাবে উপরে। তিনি সম্মান ও মর্যাদায় সকলের উপরে, পরাক্রমশালীতা ও আধিপত্যে সকলের উপরে, সসত্তায় তিনি সকলের উপরে। সকল ত্রুটির তিনি উপরে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } (٢٣) سورة سبأ

"তিনি সুউচ্চ, সুমহান।" (সাবা' ঃ ২৩)

এর ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

فوق خلقه بالقهر.

অর্থাৎ, তিনি নিজ পরাক্রমশালীতা দ্বারা সৃষ্টির উপরে।

অথচ পরাক্রমশালীতা, মর্যাদা ও সত্তায় তিনি সবার ঊর্ধ্বে। কিন্তু সম্ভবতঃ জালালুদ্দীন (আফাল্লাহু আন্না অআনহু) সসত্তায় মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বে থাকার কথা মান্য করতেন না।

বস্তুতঃ মহান আল্লাহর ঊর্ধ্বে থাকার কথা দুই শ্রেণীর মানুষেরা অস্বীকার করেছে। এক শ্রেণীকে আরবীতে 'হুলূলিয়্যাহ' (সর্বেশ্বরবাদী) বলা হয়। তারা ধারণা করে, মহান আল্লাহ সর্বত্রে আছেন। তিনি অসীম ও সর্বব্যাপী। তাঁর সত্তা সর্বত্র বিরাজমান। তার মানে, তারা তাঁকে বলে,

'আছ অনল-অনিলে, চির নভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপীলতায়, জলদের গায়
শশী-তারকায় তপনে।'

পবিত্র-অপবিত্র সকল স্থানে তিনি আছেন! নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক। নিঃসন্দেহে এটা কুফরী ধারণা।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদেরকে আরবীতে 'মুআত্ত্বিলাহ' (অর্থহীনকারী ফির্কা) বলা হয়। এরা মহান আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কিত কোন শব্দের শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করে না। যেমন মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে থাকার অর্থবোধক শব্দের অপব্যাখ্যা করে। তারা ধারণা করে, আল্লাহ সৃষ্টির উপরে আছেন, নিচে আছেন, ডাইনে আছেন, বামে আছেন, সামনে আছেন, পিছনে আছেন, সৃষ্টির সাথে একাকার আছেন, পৃথক আছেন---এ সব কিছুই বলা যাবে না। আর এই জন্যেই অনেকের ধারণা, আল্লাহ অসীম, তিনি সীমা-পরিধির ঊর্ধ্বে। অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় ষষ্ঠ দিক তাঁকে বেষ্টন করতে পারে না। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। ইত্যাদি।

কিন্তু ভাববার বিষয় যে, যে জিনিস উপরে নেই-নিচে নেই, ডানে নেই-বামে নেই, সম্মুখে নেই-পশ্চাতে নেই, আলাদা নয়-পৃথক নয়, সে জিনিসের কি অস্তিত্ব থাকতে পারে?

তাই সলফদের বিশ্বাস হল, মহান আল্লাহর সত্তা সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছে। এটাই হল সঠিক বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই কুরআন, হাদীস ও সুস্থ বিবেক সমর্থিত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} (١٠) سورة فاطر

"সৎবাক্য তাঁর দিকে আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তিনি তুলে (উঠিয়ে) নেন।" (ফাত্বির ঃ ১০)

এর ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ إليه يصعد الكلم الطيب } يعلمه وهو لا إله إلا الله ونحوها { والعمل الصالح يرفعه } يقبله.

(সৎবাক্য তাঁর দিকে আরোহণ করে) অর্থাৎ, তিনি জানেন। আর তা হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ইত্যাদি। (এবং সৎকর্ম তিনি তুলে বা উঠিয়ে নেন) মানে তা কবুল করেন।

অথচ এ হল আয়াতের স্পষ্টার্থের পরিপন্থী এবং মহান আল্লাহ ঊর্ধ্বে আছেন---এ কথার অস্বীকারোক্তি।

আব্দুল্লাহ ইবনে সায়েব ﷺ হতে বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম গগনে) ঢলে যাবার পর, যোহরের ফরযের পূর্বে নবী ﷺ চার রাকআত সুন্নত নামায পড়তেন। আর বলতেন,

((إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ)).

"এটা এমন সময়, যখন আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে সময়েই আমার সৎকর্ম ঊর্ধ্বে উঠুক।" *(তিরমিযী ৪৭৮নং, হাসান)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ফজর ও আসরের নামাযে রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা একত্রিত হন। ফজরের সময় একত্রিত হয়ে রাতের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং দিনের ফিরিশ্তা থেকে যান। অনুরূপ আসরের নামাযে একত্রিত হয়ে দিনের ফিরিশ্তা উঠে যান এবং রাতের ফিরিশ্তা থেকে যান। তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা আমার

বান্দাদেরকে কী অবস্থায় ছেড়ে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা তাদের কাছে গেলাম, তখন তারা নামায পড়ছিল এবং তাদের কাছ থেকে এলাম, তখনও তারা নামায পড়ছিল, সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদেরকে মাফ ক'রে দিন।" *(আহমাদ ৯১৪০নং, ইবনে খুযাইমা ১/ ১৬৫, ইবনে হিব্বান)*

মুসলিমের আবূ হুরাইরা কর্তৃক এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ বলেন, "অবশ্যই আল্লাহর অতিরিক্তি কিছু ভ্রাম্যমান ফিরিশ্তা আছেন, যাঁরা যিক্রের মজলিস খুঁজতে থাকেন। অতঃপর যখন কোন এমন মজলিস পেয়ে যান, যাতে আল্লাহর যিক্র হয়, তখন তাঁরা সেখানে বসে যান। তাঁরা পরস্পরকে ডানা দিয়ে ঢেকে নেন। পরিশেষে তাঁদের ও নিচের আসমানের মধ্যবর্তী জায়গা পরিপূর্ণ ক'রে দেন। অতঃপর লোকেরা মজলিস ত্যাগ করলে তাঁরা আসমানে উঠেন। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল অধিক জানা সত্ত্বেও তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমরা কোথা থেকে এলে?' তাঁরা বলেন, 'আমরা পৃথিবী থেকে আপনার এমন কতকগুলি বান্দার নিকট থেকে এলাম, যারা আপনার তাসবীহ, তাকবীর, তাহলীল ও তাহমীদ পড়ে এবং আপনার নিকট প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা আমার নিকট কী প্রার্থনা করে?' তাঁরা বলেন, 'তারা আপনার নিকট আপনার জান্নাত প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে?' তাঁরা বলেন, 'না, হে প্রতিপালক!' তিনি বলেন, 'কেমন হত, যদি তারা আমার জান্নাত দেখত?' তাঁরা বলেন, 'তারা আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে।' তিনি বলেন, 'তারা আমার নিকট কি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে?' তাঁরা বলেন, 'আপনার জাহান্নাম থেকে, হে প্রতিপালক!' তিনি বলেন, 'তারা কি আমার জাহান্নাম দেখেছে?' তাঁরা বলেন, 'না।' তিনি বলেন, 'কেমন হত, যদি তারা আমার জাহান্নাম দেখত?' তাঁরা

বলেন, 'আর তারা আপনার নিকট ক্ষমা চায়।' তিনি বলেন, 'আমি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিলাম, তারা যা প্রার্থনা করে তা দান করলাম এবং যা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তা থেকে আশ্রয় দিলাম।' তাঁরা বলেন, 'হে প্রতিপালক! ওদের মধ্যে অমুক পাপী বান্দা এমনি পার হতে গিয়ে তাদের সাথে বসে গিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'আমি তাকেও ক্ষমা ক'রে দিলাম! কারণ তারা সেই সম্প্রদায়, তাদের সাথে যে বসে সেও বঞ্চিত হয় না।' *(মুসলিম ৭০১৫নং)*

বলা বাহুল্য, এ সকল ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ও স্পষ্টার্থ গ্রহণ করাই আহলে সুন্নাহর রীতি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ} (٤)

ফিরিশতা এবং রূহ তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এক দিনে যা (পার্থিব) পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (মাআ'রিজ ঃ ৪)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

إلى مهبط أمره من السماء.

অর্থাৎ, 'তাঁর দিকে' বলতে আকাশে তাঁর নির্দেশ অবতরণস্থলে।

নিঃসন্দেহে এখানেও রয়েছে এ কথার অস্বীকৃতি যে, মহান আল্লাহ সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} (٥) سورة السجدة

"তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল বিষয় পরিচালনা করেন, অতঃপর সমস্ত কিছুই তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে -- যা তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। (সাজদাহ ঃ ৫)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

يرجع الأمر والتدبير.

অর্থাৎ, 'ঊর্ধ্বগামী হয়' মানে নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা ফিরে যায়।

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) ঊর্ধ্বগামী হওয়ার অর্থ ফিরে যাওয়া করেছেন। আর এটা এক প্রকার অর্থবিকৃতি। মহান আল্লাহ তাঁকে রহম করুন।

বলা বাহুল্য, তাঁর প্রতি আরোহণ করা, উত্থিত ও ঊর্ধ্বগামী হওয়া, মহানবী ﷺ-এর মি'রাজে সাত আসমানের উপরে যাওয়াই এ কথার দলীল যে, তিনি উর্ধ্বে আছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ} (١٦) الملك

"তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে সহ ভূমিকে ধসিয়ে দেবেন না? আর ওটা আকস্মিকভাবে কেঁপে উঠবে।" (মুল্‌ক ঃ ১৬)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

من في السماء: سلطانه وقدرته.

অর্থাৎ, আকাশে যাঁর আধিপত্য ও শক্তিমত্তা।

নিশ্চিত যে, তিনি এ কথা বলতে চাইছেন না যে, মহান আল্লাহ আসমানে আছেন। অথচ জাহমিয়া ফির্কা আবির্ভূত হওয়ার পূর্বে উম্মাহর সকল ব্যক্তি জানত, মহান আল্লাহ সপ্তাকাশের উপরে

আরশে আছেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বলেছেন, "পৃথিবীতে যে আছে, তার প্রতি দয়া কর, তাহলে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৫২২নং)*

মুআবিয়া বিন হাকাম ﷺ বলেন, আমার একটি ক্রীতদাসী ছিল, সে উহুদ ও জাওয়ানিয়ার দিকে আমার ভেড়া চরাতো। একদিন হিসাব নিয়ে দেখলাম একটি ভেড়া নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। আমি আদম সন্তানের একজন (মানুষ)। সকল মানুষের মত আমিও আফসোস করি। কিন্তু তার গালে আমি চড় মারলাম। অতঃপর আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে তা জানালে তিনি বিষয়টিকে আমার জন্য খুবই বড় বলে প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে স্বাধীন ক'রে দেব না?' তিনি বললেন, "তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" আমি তাকে তাঁর কাছে নিয়ে এলে তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, "আল্লাহ কোথায়?" সে বলল, 'আকাশে।' তিনি আবার বললেন, "আমি কে?" সে বলল, 'আল্লাহর রসূল।' তিনি বললেন, "তুমি ওকে স্বাধীন ক'রে দাও, ও একজন মু'মিন নারী।" *(মুসলিম ১২২৭নং)*

ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

إن الله في السماء وعلمه في كل مكان.

অর্থাৎ, আল্লাহ আকাশে আছেন। আর তাঁর ইল্‌ম সর্বত্র আছে। *(ই'তিক্বাদুল আইম্মাতিল আরবাআহ ১/১৪)*

ইমাম আবূ হানীফা (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

من أنكر أن الله في السماء فقد كفر.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করবে যে, আল্লাহ আসমানে আছেন, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। *(দ্রঃ আনওয়ারুল হিলালাইন ফিত-তাআক্কুবাত আলাল জালালাইন ১০পৃঃ)*

মহান আল্লাহ আরশে সমুন্নত

মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপরে আরশে আছেন। আর আরশে সমুন্নত হওয়া বিদিত, তার কেমনত্ব অবিদিত। তাঁর আরশে সমাসীন হওয়া বিদিত, কেমনত্ব অবিদিত। 'সমাসীন' মানে আসনে বসাই নয়, তার একটি মানে অবস্থান করা। কিন্তু সেই অবস্থানের কেমনত্ব আমাদের অজানা। বসার অর্থে 'সমাসীন' বা 'সমারূঢ়' বলা যাবে না। ইস্তিক্বরার ও অবস্থানের অর্থে সমাসীন বলায় দোষ হয় না।

ইমাম মালেক বলেছেন, আরবীতে 'ইস্তিওয়া' বিদিত। মানে তার অর্থ সবাই জানে। কিন্তু মহান আল্লাহর ব্যাপারে তার কেমনত্ব কেবল অবিদিত ও অজানা। তাছাড়া মানুষের 'ইস্তিওয়া'র ব্যাপারে মহান আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

{فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٢٨) سورة المؤمنون

অতঃপর যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌযানে আরোহণ করবে, তখন বলো, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে উদ্ধার করেছেন যালেম সম্প্রদায় হতে।' (মু'মিনূন ঃ ২৮)

{وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٤٤) سورة هود

আর বলা হল, 'হে ভূমি! তুমি নিজ পানি শুষে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও।' তখন পানি কমে গেল ও নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন হল। নৌকা জুদী (পাহাড়)-এর উপর স্থির হল। আর বলা হল, 'অন্যায়কারীরা আল্লাহর করুণা হতে দূর হোক।' (হূদ ঃ ৪৪)

{لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ} (١٣) سورة الزخرف

যাতে তোমরা ওর পিঠে (আরোহন করতে) স্থির হয়ে বসতে পার এবং (আরোহন ক'রে) বসে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সম্পদ স্মরণ কর ও বল, 'পবিত্র ও মহান তিনি যিনি একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; যদিও আমরা একে বশীভূত করতে সমর্থ ছিলাম না। *(যুখরুফ ঃ ১৩)*

এ হল ইস্তিওয়ার বিদিত ও জানা অর্থ। কিন্তু মহান আল্লাহর ইস্তিওয়ার ব্যাপারে কেমনত্ব অজানা। অতএব বিশদ কিছু বলার জন্য মুখ খোলা যাবে না। তাই বলা হয়, এমন সমুন্নত বা সমাসীন হওয়া, যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত। আর এ বলাও যাবে না যে, আরশে সমুন্নত বা সমাসীন হওয়ার মানে আধিপত্য বিস্তার করা। যেমন রাজা-বাদশাদের কোন রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে রাজ-সিংহাসনে বসা বা অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা বলা হয়ে থাকে।

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) অবশ্য 'ইস্তিওয়া আলাল আর্শ'-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত।' (দেখুন ঃ সূরা আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'দ ২, ত্বাহা ৫, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪,

হাদীদ ৪ আয়াত) তবে তার মানে 'ইসতীলা' (আধিপত্য বিস্তার করা বা ক্ষমতাসীন হওয়া) নয়। বরং তার মানে উপমাহীন উপর্যুক্ত ঊর্ধ্বে অবস্থান।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ} (١٥) سورة غافر

"তিনি সুউচ্চ মর্যাদাসমূহের অধিকারী, আরশের অধিপতি, তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা স্বীয় আদেশসহ ওহী (প্রত্যাদেশ) প্রেরণ করেন, যাতে সে সাক্ষাতের দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।" (মু'মিন ঃ ১৫)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'যুল-আর্শ' (আরশ-ওয়ালা)র তফসীরে লিখেছেন, 'তার স্রষ্টা।'

কিন্তু সূরা বুরূজের ১৫ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, 'তার স্রষ্টা ও মালিক।'

শুধু আরশ কেন? মহান আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। সুতরাং এ তফসীরে যেন উদ্দেশ্য না হয় যে, তিনি আরশে সমুন্নত নন।

আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (٣٥) سورة النـور

"আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি।" (নূর ঃ ৩৫)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'উভয়কে সূর্য ও চন্দ্র দ্বারা আলোকিতকারী।'

কিন্তু এ তফসীর সঠিক নয়। বরং তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর আলো; সত্তায় তিনি নূর, সিফাত ও আয়াতে তিনি নূর।

আসলে নূর হল দুই প্রকার ঃ

প্রথম ঃ যা সৃষ্ট নয়, আর তা হল মহান আল্লাহর সত্তা ও সিফাত।

তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে সানার দুআতে মহানবী ﷺ বলতেন,

(اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَ مَنْ فِيْهِنَّ)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমারই যাবতীয় প্রশংসা। তুমি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর জ্যোতি। *(বুখারী ঃ রাত্রের তাহাজ্জুদ পরিচ্ছেদ, মুসলিম ঃ মুসাফিরের নামায অধ্যায়)*

তিনি আরো বলেছেন,

((...حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ)).

"তাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর আনন-দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)*

দ্বিতীয় ঃ যা সৃষ্ট। আবার তা হল দুই শ্রেণীর ঃ দৃশ্যমান নূর ও অদৃশ্যমান নূর। দৃশ্যমান নূর হল সূর্য ও চন্দ্রের আলো। আর অদৃশ্যমান নূর, যেমন নবুঅতের নূর, ঈমানের জ্যোতি, জ্ঞানের আলো ইত্যাদি।

নিঃসন্দেহে দুই জ্যোতির মাঝে কোন সাদৃশ্য নেই। যেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোন সাদৃশ্য নেই।

মোট কথা, যদি আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে না পৃথিবীতে আলো থাকত, না আকাশে। আর না পৃথিবী ও আকাশের কেউ সুপথপ্রাপ্ত হত। অতএব আল্লাহ তাআলাই আকাশ ও পৃথিবীকে

আলোদানকারী। তাঁর গ্রন্থও আলো। তাঁর রসূলও (গুণগত দিক দিয়ে) আলো। যেমন বাল্ব্ ও প্রদীপ হতে মানুষ আলো পায়, তেমনি উক্ত দুই আলো দ্বারা মানুষ জীবন পথের অন্ধকার দূর ক'রে সঠিক পথে চলতে পারে।

অতএব আল্লাহর সত্তা নূর, তাঁর পর্দা নূর, আসল ও রূপক অর্থের প্রত্যেক নূরের তিনিই স্রষ্টা। নূর প্রদানকারী এবং তার প্রতি পথ প্রদর্শনকারীও একমাত্র তিনিই। *(আইসারুত্ তাফাসীর)*

উক্ত আয়াতেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ} (৩৫) سورة النـــور

"তাঁর জ্যোতির উপমা যেন তাকের মতো।" (নূর ঃ ৩৫)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "অর্থাৎ, মু'মিনের হৃদয়ে তার বর্ণনা।"

লক্ষণীয় যে, এখানে নূরকে কেবল মু'মিনের হৃদয়ে নূরের মাঝে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। যেহেতু এ নূর সৃষ্ট। তা আল্লাহর সিফাতী নূর নয়। হ্যাঁ, এটা তা'বীল বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা নয়। কারণ দলীলের ভিত্তিতে এমন ব্যাখ্যা করায় দোষ নেই।

মহান আল্লাহর মুখমন্ডল

মহান আল্লাহর মুখমন্ডল তাঁর সত্তাগত একটি গুণ। তাঁর মুখমন্ডল আছে, যেমন তাঁর জন্য শোভনীয়। সে মুখমন্ডল কোন সৃষ্টির মুখমন্ডলের মতো নয়। তার কোন উদাহরণ নেই, উপমা নেই। তার কেমনত্ব আমাদের অজানা; কিন্তু তার প্রতি ঈমান ওয়াজেব। মহান আল্লাহ বলেন,

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (৮৮) سورة القصص

অর্থাৎ, তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(ক্বাস্বাস ৮৮ আয়াত)*

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (٢٧)

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)। *(সূরা রহমান ২৬-২৭ আয়াত)*

সেই চেহারা বড় দীপ্তিময়, তার পর্দা হল জ্যোতি।

মহানবী ﷺ বলেন,

« حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ».

"তাঁর পর্দা (অন্তরাল) হল নূর (জ্যোতি)। যে পর্দা উন্মোচিত হলে তাঁর মুখমন্ডলের দীপ্তি সমগ্র সৃষ্টিকুলকে দগ্ধীভূত ক'রে ফেলবে।" *(মুসলিম ৪৬৩নং)*

সেই মুখমন্ডল বা চেহারা জান্নাতীরা জান্নাতে দর্শন করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ – قَالَ – يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ فَيَقُولُونَ أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ – قَالَ – فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ ».

"জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ক'রে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিশ করাওনি এবং জাহান্নাম থেকে

মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।" *(মুসলিম ৪৬৭নং)*

বলা বাহুল্য, চেহারা বা মুখমন্ডলের অপব্যাখ্যা ক'রে 'সওয়াব' বলা বৈধ নয়। যেহেতু তা শাব্দিক অর্থের বিরোধী এবং সলফদের ইজমার পরিপন্থী।

এবারে তফসীরে জালালাইন পড়ুন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} (٨٨) سورة القصص

"তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।" (ক্বাস্বাস ঃ ৮৮)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

إلا إياه

অর্থাৎ, "তাঁর সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল।"

অর্থাৎ, তিনি মুখমন্ডলের অর্থকে সত্তা বলে বিকৃত করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহর সিফাত মুখমন্ডলকে অস্বীকার করা হয়েছে। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, তাহলে তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত অন্য কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাবে যে, তিনি বা তাঁর সত্তা ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসশীল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} (٣٨) سورة الروم

"অতএব আত্মীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্ত এবং মুসাফিরকে তাদের প্রাপ্য দান কর। এ যারা আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) কামনা করে, তাদের জন্য শ্রেয়।" (রূম ঃ ৩৮)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'তাঁর সওয়াব (কামনা করে)। অনুরূপ লিখেছেন, সূরা বাক্বারার ২৭২, রূম ৩৮ এবং দাহরের ৯নং আয়াতের তফসীরে।

উলামাগণ বলেছেন, তিনি 'আল্লাহর মুখমন্ডল'-এর ব্যাখ্যা করেছেন 'তাঁর সওয়াব' দিয়ে। অথচ এ তফসীর সঠিক নয়। আসলে এ হল সেই বিকৃতকারীদের রীতি, যারা এর নাম দেয় 'তা'বীল' বা ব্যাখ্যা। (প্রকৃতপ্রক্ষে তা অপব্যাখ্যা।) এরা হল তারাই, যারা খবরমূলক সিফাতের প্রতি ঈমান রাখে না, যার খবর আল্লাহ নিজের ব্যাপারে প্রদান করেছেন। যেমন মুখমন্ডল, দুই হাত, পা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, মুখমন্ডলের তফসীর সওয়াব দিয়ে করা ভুল। এ রীতি আহলে সুন্নাহ অল-জামাআর নয়, বরং তা আহলে বিদআর, যারা নিজেদেরকে ব্যাখ্যাকারী (মুআওবিলীন) বলে অভিহিত করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তারা হল বিকৃতকারী (মুহার্রিফীন)।

সুতরাং সঠিক হল, 'অজহুল্লাহ' বলতে উদ্দেশ্য হল 'আল্লাহর মুখমন্ডল', যা তাঁর একটি সিফাত। আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে, যে ব্যক্তি উক্ত কর্মসমূহ করবে, সে ভবিষ্যতে মহান আল্লাহকে দেখতে পাবে এবং সে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। যেমন এ ব্যাপারটি কুরআন, হাদীস ও সলফদের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত যে, মু'মিনগণ তাদের প্রতিপালককে দর্শন করবে, যেমন তারা পূর্ণিমার (মেঘহীন) রাত্রে চন্দ্র দর্শন ক'রে থাকে।

মহান আল্লাহর হাত

আহলে সুন্নাহর আকীদা হল, তাঁর দুই হাত আছে---যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত। তার কোন উপমা নেই। কেমন তাও তিনিই জানেন। তিনি তাঁর দুই হাত দ্বারা আদমকে তৈরী করেছেন। তিনি ইবলীসকে বলেছিলেন,

{يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ}

অর্থাৎ, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন? *(সূরা স্বাদ ৭৫ আয়াত)*

তিনি নিজ হাতে অনেক কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} (৭১)

অর্থাৎ, ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি নিজ হাতে যা সৃষ্টি করেছি, তার মধ্যে ওদের জন্য সৃষ্টি করেছি পশু এবং ওরাই এগুলির মালিক? *(সূরা ইয়াসীন ৭১ আয়াত)*

তাঁর দুই হাত অতি দানশীল, তিনি যথেচ্ছা দান ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء} (٦٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত সংকুচিত।' তাদের হাত সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক।

বরং আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান ক'রে থাকেন। *(সূরা মাইদাহ ৬৪ আয়াত)*

তিনি নিজ হাতে তাওরাত লিখেছেন। মহানবী ﷺ বলেন,

((احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالَ لَهُ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلاَمِهِ وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ (كَتَبَ لَكَ التَّوْرَاةَ بِيَدِهِ)...

অর্থাৎ, একদা আদম ও মূসায় তর্কে লিপ্ত হলেন। মূসা বললেন, 'হে আদম! আপনি আমাদের পিতা। আপনি আমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন ও জান্নাত থেকে বের করেছেন।' আদম তাঁকে বললেন, 'তুমি মূসা। আল্লাহ তোমাকে নিজ (সরাসরি) কথোপকথন দ্বারা নির্বাচিত করেছেন এবং তোমার জন্য নিজ হাতে তওরাত লিখেছেন।' *(বুখারী ৬৬১৪, মুসলিম ২৬৫২নং)*

তিনি কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে নিজ হাতে রুটি বানিয়ে দেবেন।

মহানবী ﷺ বলেন,

((تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ....)) متفق عليه

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির মত হবে। প্রতাপশালী (আল্লাহ) তা নিজ হাতে নিয়ে উলটপালট করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার রুটিকে উলটপালট করে। তা হবে বেহেশ্‌তীদের মেহমানী (আহার)। *(বুখারী, মুসলিম)*

তাঁর উভয় হাতই ডান। মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ

وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا)).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট যারা ন্যায়পরায়ণ তারা দয়াময়ের ডান পার্শ্বে জ্যোতির মিম্বরের উপর অবস্থান করবে। আর তাঁর উভয় হস্তই ডান। (ঐ ন্যায়পরায়ণ তারা) যারা তাদের বিচারে, পরিবারে এবং তার কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিবর্গের ব্যাপারে ন্যায়নিষ্ঠ।" *(মুসলিম ১৮২৭নং)*

তাঁর করতলের কথাও শুদ্ধভাবে প্রমাণিত। মহানবী ﷺ বলেন,

((مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ – وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ – إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ)).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। (অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন;) পরিশেষে তা রহমানের করতলে বৃদ্ধিলাভ ক'রে পাহাড় থেকেও বড় হয়ে যায়। যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন ক'রে থাকে। *(বুখারী ১৪১০, মুসলিম ১০১৪নং, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি)*

লক্ষণীয় যে, 'হাত' শব্দটি কোথাও একবচন, কোথাও দ্বিবচন এবং কোথাও বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী বাক্যগঠনে এমনটি বৈধ। বহুবচন শব্দের সাথে তার সম্বন্ধই দ্বিবচনকে বহুবচনরূপে ব্যবহার করার বৈধতা প্রদান করে।

কুরআন ও হাদীসে হাতের এত বিস্তারিত বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও সঊদী আরব থেকে ছাপা (বর্তমানে নিষিদ্ধ) তফসীর 'মাআরিফুল ক্বুরআন'-

এ 'আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি'র তফসীরে বলা হয়েছে, 'সকল তফসীরবিদই এ ব্যাপারে একমত যে, মানুষের ন্যায় আল্লাহ তাআলারও হাত আছে, এখানে তা বেঝানো হয়নি। কেননা, আল্লাহ তাআলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এর অর্থ হল আল্লাহর কুদরত।' *(১১৭২পৃঃ)*

কিন্তু সঠিক বিশ্বাস এই যে, এ সব যেভাবে এসেছে, সেইভাবেই বিশ্বাস করতে হবে। এ সব তাঁর অঙ্গ কি না, সে প্রশ্ন মাথায় আনা চলবে না। আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত তাঁর কিছু নয় অথবা তা রক্ত-মাংস-হাড়বিশিষ্ট নয়। তিনি কেমন -- তা আমাদের যেমন জানা নেই, তেমনি তাঁর এ সকল গুণ কেমন ---তা আমাদের অজানা। এ সবের অন্য অর্থও করতে পারি না। 'হাত' মানে কুদরত বা নিয়ামত করলে অর্থ সঠিক হয় না। আল্লাহর নিজের দুই কুদরত বা দুই নিয়ামত দিয়ে আদমকে সৃষ্টি করার কি অর্থ হতে পারে? 'আল্লাহর দুটো কুদরতই ডান' কথার কী অর্থ হতে পারে?

এবারে চলুন, আমাদের আলোচিত তফসীরে জালালাইনে 'হাত'-এর কী অপব্যাখ্যা করা হয়েছে, তা দেখে নিই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء} (٦٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত সংকুচিত।' তাদের হাত সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান ক'রে থাকেন। *(সূরা মাইদাহ ৬৪ আয়াত)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

مبالغة في الوصف بالجود، وثنى اليد لإفادة الكثرة، إذ غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطي بيديه.

'এ হল দানশীলতার গুণ বর্ণনার জন্য অতিশয়োক্তি। আর হাত শব্দকে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে আতিশয্য বোঝাবার উদ্দেশ্যেই। যেহেতু দাতার দান করার শেষ পরিণতিই হল, সে দুই হাতে দান ক'রে থাকে।'

এখানে তিনি অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর হাতের কথা অস্বীকার করেছেন। মহান আল্লাহর দানশীলতার কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু হাতের অপব্যাখ্যা করা বাঞ্ছনীয় নয়; বরং বৈধই নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ}

অর্থাৎ, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল? তুমি কি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন? *(সূরা স্বাদ ৭৫ আয়াত)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) এর তফসীরে লিখেছেন,

أي توليت خلقه، وهذا تشريف لآدم، فإن كل مخلوق تولى الله خلقه.

'(আমি যাকে নিজ দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি) অর্থাৎ, আমি নিজে তার সৃষ্টির তত্ত্বাবধান করেছি। আর এ হল আদমের জন্য মর্যাদার বিবরণ। নচেৎ আল্লাহ প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর সৃষ্টিরই তত্ত্বাবধান ক'রে থাকেন।'

আল্লাহ লেখককে ক্ষমা করুন। দুই হাতের অর্থ আদম সৃষ্টির তত্ত্বাবধান নয়। বরং এ হল মহান আল্লাহর 'হাত' সিফাতকে

অস্বীকার করা, যা আয়াতে স্পষ্ট শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। অথচ সলফগণ হাত দ্বারা সৃষ্টি করার কথা অস্বীকার করেননি।

মুফাস্‌সির ইবনে জারীর ত্বাবারী বলেছেন, 'এর দ্বারা আল্লাহ তাআলা যিকরুহ জানাচ্ছেন যে, তিনি আদমকে নিজ দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর তিনি নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমার ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ চারটি জিনিসকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন ঃ আরশ, আদন (জান্নাত), কলম ও আদম। অতঃপর সকল বস্তুর উদ্দেশ্যে 'হও' বলেছেন, আর হয়ে গেছে।" *(তফসীর ত্বাবারী ২১/২৩৯)*

পরন্তু যদি উক্ত বাক্যের অর্থ আদমকে হাত দ্বারা সৃষ্টি করা না হতো, তাহলে আদম সৃষ্টির পৃথক কোন বৈশিষ্ট্য ও তাঁর পৃথক কোন মর্যাদা প্রকাশ পেত না। যেহেতু প্রত্যেক সৃষ্টিকেই তিনি নিজ কুদরত ও তত্ত্বাবধানেই সৃষ্টি করেছেন। বরং যে শয়তানকে আদেশ করা হয়েছিল আদমকে সিজদা করতে, সেই শয়তান অপেক্ষা আদমের মর্যাদা অধিক প্রমাণিত হতো না; যেহেতু শয়তানকেও মহান আল্লাহ নিজ কুদরত ও তত্ত্বাবধানেই সৃষ্টি করেছেন।

বলা বাহুল্য, 'আল্লাহর হাত' মানে 'আল্লাহর কুদরত' করার যুক্তিও অসার ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٧) سورة الزمر

"ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর

ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।" (যুমার ঃ ৬৭)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) এর তফসীরে লিখেছেন,

ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به غيره (وَالأَرْضُ جَمِيعاً) حال: أي السبع (قَبضَتُه) أي مقبوضه له: أي في ملكه وتصرفه (يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ) مجموعات (بيَمِينِه) بقدرته....

'ওরা তাঁকে যথোচিতভাবে চেনেনি অথবা ওরা তাঁর যথোচিত মর্যাদা দান করেনি; তাই ওরা তাঁর সাথে শির্ক করেছে। (কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে) অর্থাৎ, তাঁর কবজা ও আয়ত্তে থাকবে, অর্থাৎ তাঁর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। আর (আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে) অর্থাৎ, কুদরতে (গুটানো থাকবে) অর্থাৎ, একত্রীভূত থাকবে।'

অথচ এর ব্যাখ্যা হাদীসে পরিষ্কার এসেছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ).

"আল্লাহ পৃথিবীকে মুষ্টিগত করবেন এবং আকাশমন্ডলীকে ডান হাতে গুটিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, 'আমিই বাদশা। কোথায় পৃথিবীর বাদশাগণ?" *(বুখারী ৪৮১২, মুসলিম ৭২২৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((تَكُونُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّؤُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهِ كَمَا يَكْفَأُ أَحَدُكُمْ خُبْزَتَهُ فِي السَّفَرِ نُزُلًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ....))

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন পৃথিবী একটি রুটির মত হবে। প্রতাপশালী

(আল্লাহ) তা নিজ হাতে নিয়ে উলটপালট করবেন, যেমন তোমাদের কেউ সফরে তার রুটিকে উলটপালট করে। তা হবে বেহেশ্‌তীদের মেহমানী (আহার)। *(বুখারী ৬৫২০, মুসলিম ৭২৩৫নং)*

সুতরাং যেখানে স্পষ্ট বিবরণ থাকে, সেখানে অপব্যাখ্যার কোন সুযোগই থাকে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١) سورة الملك

মহা মহিমান্বিত তিনি সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর হাতে এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (মুল্‌ক ঃ ১)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) এর তফসীরে লিখেছেন, 'যাঁর হাতে' অর্থাৎ, যাঁর নিয়ন্ত্রণে।

করায়ত্তে থাকার রূপক অর্থ হিসাবে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থপনার অধীনে থাকাকে বুঝায়। কিন্তু মহান আল্লাহর আসমা ও সিফাতসমূহে স্পষ্টার্থ বর্জন ক'রে রূপকার্থের সাহায্য নেওয়া সলফদের রীতি নয়।

{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} (١٠) الفتح

"নিশ্চয় যারা তোমার বায়আত গ্রহণ করে, তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর।" *(ফাত্‌হ ঃ ১০)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

التي بايعوا بها النبي أي هو تعالى مطلع على مبايعتهم فيجازيهم عليها.

অর্থাৎ, যে হাতসমূহ দ্বারা তাঁরা নবী ﷺ-এর বায়আত করেছিলেন। উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তাআলা তাঁদের বায়আতের ব্যাপারে অবহিত ছিলেন। ফলে তিনি তাঁদেরকে তার প্রতিদান দেবেন।

বাস্তবে মহান আল্লাহর 'হাত'কে তিনি অস্বীকার করে আয়াতের

অপব্যাখ্যা করেছেন। অথচ আয়াত থেকে চারটি জিনিস প্রমাণিত হয়ঃ-

১। মহান আল্লাহর হাত, যেমন তাঁর জন্য উপযুক্ত। তার কোন উদাহরণ নেই।

২। মহান আল্লাহ সৃষ্টির উর্ধ্বে আছেন।

৩। রসূল ﷺ-এর মাধ্যমে মহান আল্লাহই বায়আত গ্রহণকারী ছিলেন। যেমন ইবনে কাষীর প্রভৃতি তফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে।

৪। বায়আতকারীদেরকে সমর্থন, সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

মহান আল্লাহর পদনালী

আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ} (٤٢) القلم

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যেদিন পায়ের রলা উন্মোচন করা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না। *(সূরা ক্বালাম ৪২ আয়াত)*

কিন্তু জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

هو عبارة عن شدة الأمر يوم القيامة للحساب والجزاء.

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন হিসাব ও বদলার জন্য কঠিন সংকটের বিবরণ।

এই জন্যই অনেকে উক্ত আয়াতের অনুবাদ করেছেন, 'স্মরণ কর, সে চরম সংকটের দিনের কথা, সেদিন ওদের সিজদা করার জন্য আহবান করা হবে, কিন্তু ওরা তা করতে সক্ষম হবে না।'

এ সম্পর্কে মওলানা আকরাম খাঁ সাহেব লিখেছেন, 'এই পদের ব্যবহারিক তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া এবং আরবী সাহিত্যের সর্ব্ববাদীসম্মত বাক্‌ধারাকে অগ্রাহ্য করিয়া, একদল লেখক উহার অর্থ করিয়াছেন ঃ- "যেদিন আল্লাহর পায়ের পিণ্ডলিকাকে উন্মুক্ত করা হইবে।" কিন্তু ইহা আরবী ভাষার একটা ইডিয়ম। কোনও গুরুতর পরিস্থিতি উপস্থিত হইলে আরবরা ঐ ইডিয়মটা ব্যবহার করিয়া থাকে।' *(তফসীর ৫/৫৮৭)*

কিন্তু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ فَيَبْقَى كُلُّ مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا).

"(কিয়ামতে) আমাদের প্রতিপালক নিজ পদনালী উন্মুক্ত করবেন। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিন-মু'মিনা তাঁর জন্য সিজদাবনত হবে। কিন্তু প্রত্যেক সেই ব্যক্তি অবশিষ্ট থেকে যাবে, যে দুনিয়াতে লোককে দেখানো ও শোনানোর জন্য সিজদা করত। সে সিজদা করতে যাবে, কিন্তু তার পিঠ একটি পাটা বা প্লেটের মতো হয়ে যাবে। *(বুখারী ৪৯১৯নং, মুসলিম ৪৭২নং)*

জেনে রাখা ভালো যে, এই আয়াতের তফসীরে কিয়ামতের কঠিন সংকটের কথা অনস্বীকার্য। তবে হাদীস দ্বারা মহান আল্লাহর পদনালী, পিন্ডলী, পিন্ডলিকা বা গোছার কথা প্রমাণিত, যা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার উপায় নেই এবং আয়াতের স্পষ্টার্থ তাই।

মহান আল্লাহর ইচ্ছা

মহান আল্লাহর ইচ্ছার অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ} (١٦) سورة البروج

"তিনি যা ইচ্ছা, তাই ক'রে থাকেন।" (বুরুজ ঃ ১৬)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'তাঁকে কোন কিছু ব্যর্থ করতে পারে না।'

এ হল 'ইচ্ছাময় কর্তা'-এর পরিণামগত অর্থ। বলা বাহুল্য, তাঁর একটি সিফাত হল 'ইরাদা'। তাঁর ইরাদা ও ইচ্ছার বিরোধিতা কেউ করতে পারে না। তাঁর ফায়সালার খন্ডন করার ক্ষমতা কারো নেই এবং তাঁর সিদ্ধান্ত টালবার শক্তি কেউ রাখে না।

মহান আল্লাহর রহমত

মহান করুণাময় আল্লাহ। অতি দয়াবান তিনি। রহমত তাঁর একটি সিফাত ও গুণ। কিন্তু তফসীরে সেই সিফাতের পরিণামগত অর্থ বা ব্যাখ্যা ক'রে তাঁর রহমতের কথা গোপন করা হয়েছে। কুরআনের ভুমিকায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ} (٢) سورة الفاتحة

"যিনি অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু।" (ফাতিহা ঃ ২)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

أي ذي الرحمة وهي إرادة الخير لأهله.

অর্থাৎ, রহমত-ওয়ালা। আর তা হল, মঙ্গলের উপযুক্ত লোকের জন্য মঙ্গল করার ইচ্ছা পোষণ করা।

অথচ এ হল রহমতের পরিণামগত অর্থ। রহমত গুণ থাকলে তবেই অপরের জন্য মঙ্গল কামনা করা যায়। আসলে শব্দকে তার প্রকৃতার্থ থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া এক প্রকার তা'ত্বীল (অর্থবিহীন, নিষ্ক্রিয় বা বিরহিতকরণ)। আর সে রীতি আহলে সুন্নাহর নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ } (٤٣)

"আমি আমার করুণাস্বরূপ ও বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশস্বরূপ তাকে দিলাম তার পরিজনবর্গ ও তাদের মত আরও (অনেক কিছু)।" (স্বাদ ঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত রহমতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, নিয়ামতস্বরূপ।

আসলে নিয়ামতও মহান আল্লাহর করুণার পরিণামগত অর্থ। আল্লাহর রহমত তাঁর সিফাত, সৃষ্টি নয়। নিয়ামত সৃষ্টি। যেমন মহান আল্লাহ সৃষ্ট জান্নাতকে তাঁর রহমত বলেছেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((احْتَجَّتِ الجَنَّةُ وَالنَّارُ ، فَقَالَت النَّارُ : فِيَّ الْجَبَّارُونَ والْمُتَكَبِّرُونَ . وَقَالَتِ الجَنَّةُ : فِيَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِينُهُم ، فَقَضَى اللهُ بَينَهُمَا : إِنَّكِ الجَنَّةُ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ ، وَلِكِلَيْكُمَا عَلَيَّ مِلْؤُهَا)).

"জান্নাত এবং জাহান্নাম পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া করল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে বড় বড় উদ্ধত এবং অহংকারীরা বসবাস করবে।' আর জান্নাত বলল, 'আমার মধ্যে দুর্বল এবং মিসকীনরা

বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে মীমাংসা করলেন যে, 'হে জান্নাত! তুমি আমার রহমত, আমি তোমার দ্বারা যার প্রতি ইচ্ছা রহম করব। আর হে দোযখ! তুমি আমার শাস্তি, আমি তোমার দ্বারা যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেব। আর তোমাদের দুটোকেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম ৭৩৫৫নং)*

মহান আল্লাহ তাঁর বৃষ্টির নিয়ামতকে রহমতের চিহ্ন বলেছেন,

{فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٥٠) سورة الروم

"সুতরাং তুমি আল্লাহর করুণার চিহ্ন লক্ষ্য কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (রূম ঃ ৫০)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢٣) سورة العنكبوت

"যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে, তারাই আমার করুণা হতে নিরাশ হয়। আর তাদের জন্য আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।" (আনকাবূত ঃ ২৩)

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) রহমতের ব্যাখ্যা করেছেন 'জান্নাত' দিয়ে। অথচ এখানে এমন করাটা ঠিক ছিল না। এখানে আম রহমত উদ্দিষ্ট হওয়াটাই স্পষ্ট।

মহান আল্লাহর ভালবাসা

ভালবাসা তাঁর একটি কর্মগত গুণ। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে ভালবাসেন। তিনি বলেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (٣١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

(٥٤) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ ধর্ম হতে ফিরে গেলে আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় আনয়ন করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন ও যারা তাঁকে ভালবাসবে, তারা হবে বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল ও অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভয় করবে না, এ আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা মাইদাহ ৫৪ আয়াত)*

তাঁর রয়েছে খাঁটি ভালবাসা। তিনি বলেন,

{وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} (١٤) سورة البروج

অর্থাৎ, তিনিই ক্ষমাশীল, প্রেমময়। *(সূরা বুরূজ ১৪ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, তাঁর ভালবাসার অর্থ পুরস্কার, অনুগ্রহ অথবা সওয়াব করা বৈধ নয়। যেমন অনেকে বলে থাকে, 'না না, ভালবাসা তো হৃদয়ের জিনিস। আল্লাহর কি হৃদয় আছে নাকি? আল্লাহ কি মানুষের মতো নাকি? ভালবাসা তো এক প্রকার দুর্বলতা। ভালবাসায় তো মন বাঁধা যায়? সেটা কি আল্লাহর জন্য সম্ভব?'

আসলে ওদের মুশকিলটাই হল এখানে; ওরা মানুষের মতো কোন গুণের কথা শুনলে আল্লাহকেও মানুষের মতো খেয়াল ক'রে প্রত্যেক গুণকে অস্বীকার করে। আর এর ফলে নিঃসন্দেহে তারা আহলে সুন্নাহ থেকে খারিজ।

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) সূরা বাক্বারার ১৯৫, ২২২, আলে ইমরানের ৭৬, ১৩৪ ও ১৪৬নং, সূরা মায়েদার ৪২, ৯৩নং এবং সূরা তাওবার ১০৮নং আয়াতে মহান আল্লাহর ভালোবাসার ব্যাখ্যায় সওয়াব দানের কথা লিখেছেন। এ কথা ঠিক যে, সওয়াব দান মহব্বত ও ভালোবাসারই পরিণামগত অর্থ। কিন্তু দুটি কর্ম এক নয়।

অনুরূপ সূরা স্বাফ্ফের ৪নং আয়াতে মহান আল্লাহর মুজাহিদীনদেরকে ভালোবাসার ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'তিনি সাহায্য করেন ও সম্মানিত করেন।'

নিঃসন্দেহে সাহায্য ও সম্মান লাভ তাঁর ভালোবাসারই পরিণাম। কিন্তু তা হলেও তাঁর ভালোবাসাকে অস্বীকার করা যায় না।

তদনুরূপ সূরা বুরূজের ১৪নং আয়াতে ভালোবাসার ব্যাখ্যায় সম্মানদানের কথা উল্লেখ করেছেন। যা আসলে অপব্যাখ্যা।

আর সূরা বাক্বারার ২৭৬, আলে ইমরান ৩২, ৫৭, ১৪০, নিসা ১০৭, ১৪৮, মাইদাহ ৬৪, নাহ্ল ২৩, হাজ্জ ৩৮, ক্বাস্বাস ৭৭, রূম ৪৫, শূরা ৪০ আয়াতে মহান আল্লাহর ভালো না বাসার ব্যাখ্যায় বলেছেন, তিনি শাস্তিদান করবেন।

এ কথা ঠিক যে, শাস্তিদান ভালো না বাসারই পরিণামগত অর্থ। কিন্তু দুটি কর্ম এক নয়।

মহান আল্লাহর বাণী ও কুরআন

আল্লাহ তাআলা বান্দাকে সম্বোধন করেন, বলেন, আদেশ করেন, উপদেশ দেন। তাঁর বাণী অহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরাল থেকে কিংবা দূত মারফৎ মানুষের কাছে পৌঁছে থাকে। তিনি বলেন,

{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٥١) سورة الشورى

অর্থাৎ, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় যে, আল্লাহ তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন ওহীর (প্রত্যাদেশ) মাধ্যম ব্যতিরেকে, অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা কোন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে; আর তখন আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে অহী (প্রত্যাদেশ) করেন; নিঃসন্দেহে তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা শূরা ৫১ আয়াত)*

তিনি মূসা কালীমুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ত্বূর পাহাড়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেন,

{وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (١٦٤) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি অনেক রসূলের কথা পূর্বে তোমার নিকট বর্ণনা

করেছি এবং অনেক রসূলের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন। *(নিসা ১৬৪ আয়াত)*

{وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (١٤٣) قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ} (١٤٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, মূসা যখন আমার নির্ধারিত স্থানে উপস্থিত হল এবং তার প্রতিপালক তার সঙ্গে কথা বললেন, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দর্শন দাও, আমি তোমাকে দেখব।' তিনি বললেন, 'তুমি আমাকে কখনই দেখবে না। তুমি বরং পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর, যদি তা স্বস্থানে স্থির থাকে, তাহলে তুমি আমাকে দেখবে।' সুতরাং যখন তার প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতিষ্মান হলেন, তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল আর মূসা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেল। অতঃপর যখন সে জ্ঞান ফিরে পেল, তখন বলল, 'মহিমময় তুমি! আমি অনুতপ্ত হয়ে তোমাতেই প্রত্যাবর্তন করলাম এবং বিশ্বাসীদের মধ্যে আমিই প্রথম।' তিনি বললেন, 'হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও বাক্য দ্বারা লোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি, সুতরাং আমি যা দিলাম, তা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও। *(সূরা আ'রাফ ১৪৩-১৪৪ আয়াত)*

আদম-সহ নবীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তিনি মি'রাজের রাতে শেষনবী ﷺ-এর সাথে কথা বলেছেন। কিয়ামতের দিনে তিনি বান্দার সাথে কথা বলবেন।

"আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী ১১৪৫, ৭৪৯৪, মুসলিম ১৮০৮, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

যখন ইচ্ছা তিনি বলেন, যা ইচ্ছা বলেন। 'আযাল' থেকে সর্বদা যে কোন সময়ে তিনি কথা বলেন। আর সে বলার কোন দৃষ্টান্ত নেই, কোন রকমত্ব নেই। কোন সৃষ্টির বলার মত তাঁর বলা নয়।

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর বাণী বা কথা বলার কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا} (١٠٩) سورة الكهف

তুমি বল, 'আমার প্রতিপালকের বাণী লিপিবদ্ধ করবার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়, তাহলে আমার প্রতিপালকের বাণী শেষ হবার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে; সাহায্যার্থে যদিও এর মত আরো একটি সমুদ্র আনয়ন করি।' (কাহফ ঃ ১০৯)

{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢٧) سورة لقمان

পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। *(লুক্বমানঃ ২৭)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ ما نفدت كلمات الله } المعبر بها عن معلوماته بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد ولا بأكثر من ذلك لأن معلوماته تعالى غير متناهية.

'(আল্লাহর বাণী শেষ হবে না) অর্থাৎ, উক্ত পরিমাণ কালি ও কলম বা তারও বেশি কালি-কলম দ্বারা লিখে তাঁর জ্ঞানভান্ডার শেষ হবে না। যেহেতু তাঁর জ্ঞানভান্ডার অন্তহীন।'

বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর বাণী বলতে তাঁর জ্ঞানভান্ডার বুঝা সলফগণের বুঝের পরিপন্থী এবং স্পষ্ট শব্দ থেকে দূরে সরে অর্থ গ্রহণের নামান্তর। বরং তাঁর বাণী, তাঁর কথা। যার কোন শেষ নেই। যেহেতু তিনিই প্রথম, তাঁর কোন শুরু নেই এবং তিনিই অন্ত, তাঁর কোন শেষ নেই। তিনি কথা বলেছেন, বলছেন ও বলবেন। যা ইচ্ছা, যেমন ইচ্ছা ও যখন ইচ্ছা তিনি কথা বলেন। তাঁর কথা ও বাণীর কোন শেষ নেই, অন্ত নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (٦٨)

"তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।" *(মু'মিনঃ ৬৮)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا } أراد إيجاد شيء { فإنما يقول له كن فيكون } بضم النون وفتحها بتقدير أن أي يوجد عقب الإرادة التي هي معنى القول المذكور

(তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি কিছু করা স্থির করেন,) অর্থাৎ, কোন জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, (তখন

তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়।)----অর্থাৎ, সেই ইচ্ছার সাথে সাথেই সৃষ্টি হয়ে যায়, যা উক্ত বলার অর্থ।

উলামাগণ বলেন, এখানে মহান আল্লাহর কথা বলাকে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ, "তিনি বলেন, 'হও' এবং তা হয়ে যায়"-এর মানে হল, তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে তা হয়ে যায়। তাঁকে কিছু বলতে হয় না। আর এল সিফাতের অপব্যাখ্যা বা অস্বীকারকারী আশআরীদের মতবাদ।

সঠিক হল, তিনি জিনিস সৃষ্টি করার ইচ্ছা করলে তিনি তার উদ্দেশ্যে শ্রাব্য কথায় বলেন, 'হও' এবং তাঁর কথা শুনে ও মান্য ক'রে তা হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ } (٥٥) سورة العنكبوت

"সেদিন শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করবে ওদের উপর দিক ও নিচের দিক হতে এবং তিনি বলবেন, 'তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর।" *(আনকাবূত ঃ ৫৫)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول } فيه بالنون أي : نأمر بالقول وبالياء يقول : أي : الموكل بالعذاب { ذوقوا ما كنتم تعملون } .

(সেদিন শাস্তি ওদেরকে গ্রাস করবে ওদের উপর দিক ও নিচের দিক হতে এবং) ن দিয়ে نقول মানে, আমি বলার আদেশ করব। আর ي

দিয়ে يقول মানে আযাবে নিযুক্ত ফিরিশতা বলবেন, (তোমরা যা করতে, তার স্বাদ গ্রহণ কর।)

উলামাগণ বলেন, 'আমি বলার আদেশ করব' প্রকৃতপক্ষে এটা এক প্রকার অর্থ-বিকৃতি। এমন সুযোগ হয়তো এখানে রয়েছে। কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে উক্তরূপ অপব্যাখ্যার কোন সুযোগই নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ (١٠٨) إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١٠٩) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (١١٠) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ} (١١١) المؤمنون

তিনি বলবেন, 'তোমরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক এবং আমার সাথে কোন কথা বলো না। আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল যারা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি; সুতরাং তুমি আমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দাও ও আমাদের উপর দয়া কর, তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে তোমরা এতো ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে যে, তা তোমাদেরকে আমার কথা ভুলিয়ে দিয়েছিল; তোমরা তো তাদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টাই করতে। আমি আজ তাদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে এমনভাবে পুরস্কৃত করলাম যে, তারাই হল সফলকাম।' (মু'মিনূন ঃ ১০৮-১১১)

এখানে কি 'তিনি বলতে আদেশ করবেন' অর্থ করা যাবে? মোটেই না। কারণ এর আগে আছে,

{تَلْفَحُ وُجُوهَهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (١٠٤) أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ (١٠٦) رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ} (١٠٧)

"আগুন তাদের মুখমন্ডলকে দগ্ধ করবে এবং তারা সেখানে থাকবে বীভৎস চেহারায়। তোমাদের নিকট কি আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হতো না? অথচ তোমরা সেগুলিকে মিথ্যা মনে করতে। তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! দুর্ভাগ্য আমাদেরকে পেয়ে বসেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত সম্প্রদায়। হে আমাদের প্রতিপালক! এই আগুন হতে আমাদেরকে উদ্ধার কর; অতঃপর আমরা যদি পুনরায় অবিশ্বাস করি, তাহলে অবশ্যই আমরা সীমালংঘনকারী হব।" *(মু'মিনূনঃ ১০৪-১০৭)*

আর পরবর্তী (১০৯নং) আয়াতে রয়েছে, "আমার বান্দাদের মধ্যে একদল ছিল----।" সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি হলেন মহান আল্লাহ এবং কথা হল তাঁরই।

কুরআন মাজীদ তাঁরই বলা 'কালাম' (বাণী)। তা কোন সৃষ্টি নয়, বরং তা তাঁর একটি গুণ। কিন্তু তাঁর এই আয়াত

{إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٣) سورة الزخرف

"আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (যুখরুফ ঃ ৩)

কিন্তু জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ إنا جعلناه } أوجدنا الكتاب { قرآنا عربيا } بلغة العرب

অর্থাৎ, আমি কুরআনকে আরবের ভাষায় সৃষ্টি করেছি।

নিঃসন্দেহে এ ব্যাখ্যা একটি বাতিল ব্যাখ্যা। সম্ভবতঃ তিনি জাহমী ও মু'তাযিলী মুফাস্সির যামাখশারী দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে উক্ত তফসীর করেছেন। যেহেতু তিনিও তাঁর তফসীরগ্রন্থে 'আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় সৃষ্টি করেছি' তফসীর করেছেন। *(তাফসীর কাশ্শাফ ৪/২৪১)*

পক্ষান্তরে সঠিক তফসীর হল, "আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" যেমন ইবনে জারীর (২১/৫৬২) ও ইবনে কাষীর (৭/২১৮) এই তফসীরই করেছেন।

উক্ত আয়াতের অনুরূপ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٢) سورة يوسف

"নিশ্চয় আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" *(ইউসুফ ঃ ২)*

সুতরাং এই আয়াত ঐ আয়াতের তফসীর। আর এটাই সঠিক তফসীর।

মহান আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ

'আম্‌র' শব্দের অর্থ ব্যাপার বা বিষয় হতে পারে। আর তার বহুবচন হল 'উমূর'। তেমনি 'আম্‌র' শব্দের অর্থ আদেশ, নির্দেশ বা আজ্ঞা হতে পারে। আর তার বহুবচন হল 'আওয়ামির'।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (٨٢) سورة يس

"তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়।" *(ইয়াসীনঃ ৮২)*

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) আম্‌রের অর্থ নিয়েছেন 'ব্যাপার'। অথচ 'নির্দেশ'ও নেওয়া যেতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢٤) سورة يونس

"বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে

অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা ক'রে থাকি।" (ইউনুসঃ ২৪)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ} (٥٨) سورة هود

"আর যখন আমার (শাস্তির) হুকুম এসে পৌঁছল, তখন আমি হূদকে এবং যারা তার সাথে বিশ্বাসী ছিল তাদেরকে স্বীয় করুণায় রক্ষা করলাম। আর তাদেরকে বাঁচিয়ে নিলাম অতি কঠিন শাস্তি হতে।" *(হূদঃ ৫৮)*

উপর্যুক্ত দুই আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) আম্‌রের অর্থ নিয়েছেন 'ফায়সালা' অথবা 'আযাব'। অথচ সেটা হল উক্ত 'আম্‌র'-এর পরিণামগত অর্থ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٥٤) سورة الأعراف

"নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হন। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; ওদের একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে। আর (সৃষ্টি করেছেন) সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজিকে, যা তাঁরই আজ্ঞাধীন। জেনে রাখ, সৃষ্টি করা এবং

নির্দেশদান তাঁরই কাজ। তিনি মহিমময় বিশ্ব প্রতিপালক।" (আ'রাফ ঃ ৫৪)

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) আম্‌রের অর্থ নিয়েছেন 'কুদরত' বা ক্ষমতা। অথচ 'নির্দেশ' বা 'আজ্ঞা' 'আম্‌র'-এর আসল অর্থ। এই তফসীরে তিনি শব্দ থেকে বহু দূরে সরে গিয়ে অর্থ গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, এই স্থলে ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, '---এ সব কিছু তাঁরই আজ্ঞাধীন। তিনি তাদেরকে আদেশ করেছেন, তারা তাঁর আদেশ পালন করেছে। তাঁরই সকল সৃষ্টি ও আদেশ, যা লঙ্ঘনীয় নয়। তিনি ছাড়া কোন কিছুই তাঁর আদেশ রদ্দ করতে পারে না। সে উপাস্য ও প্রতিমাগুলোও পারে না, মুশরিকরা যাদের উপাসনা ক'রে থাকে, যারা কোন অপকার করতে পারে না, উপকার করতে পারে না, সৃষ্টি করতে পারে না এবং নির্দেশ দিতে পারে না।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{غُلِبَتْ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) سورة الروم

"রোমকগণ পরাজিত হয়েছে ---(আরবের) নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে---কয়েক বছরের মধ্যেই, আগের ও পরের সকল নির্দেশ আল্লাহরই। সেদিন বিশ্বাসীরা আনন্দিত হবে।" (রূম ঃ ২-৪)

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) আম্‌রের অর্থ নিয়েছেন 'ইরাদা' বা ইচ্ছা। অথচ ইচ্ছা কোন বচন নয়, আর আদেশ-নির্দেশ হল বচন ও হুকুম। যে হুকুম ক'রে কোন কিছুর উদ্দেশ্যে 'হও' বললেই তা হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } (١٢) سورة النحل

"তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিবস, সূর্য এবং চন্দ্রকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন রয়েছে তাঁরই আজ্ঞার; অবশ্যই এতে বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।" *(নাহলঃ ১২)*

উক্ত আয়াতেও 'আম্‌র' বা আজ্ঞার মানে করেছেন 'ইরাদা' বা ইচ্ছা। বিদিত যে, আশআরী ফির্কার লোকেরা মহান আল্লাহর বাচনিক আদেশ-নির্দেশ বা কথাকে বিশ্বাস করে না, বিধায় তারা নানা অপব্যাখ্যা করে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٤٦) سورة الروم

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন; যাতে তিনি তোমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ আস্বাদন করান এবং যাতে তাঁর নির্দেশে জলযানগুলি বিচরণ করে, আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তাঁর কৃতজ্ঞ হতে পার।" (রূম ঃ ৪৬)

এখানেও তিনি 'আম্‌র' বা নির্দেশের অর্থ নিয়েছেন 'ইরাদা' বা ইচ্ছা। অথচ জলযান আল্লাহর ইচ্ছা জানতে পারে না। তাঁর বাচনিক হুকুম ছাড়া কোন কিছুই সৃষ্টি হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} (٨٢) سورة يـس

"তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়।" (ইয়াসীন ঃ ৮২)

{إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} (٤٠) سورة النحل

"আমি কোন কিছু করার ইচ্ছা করলে সে বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।" (নাহল ঃ ৪০)

মহান আল্লাহর লজ্জাবোধ

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় তোমাদের প্রভু লজ্জাশীল অনুগ্রহপরায়ণ, বান্দা যখন তাঁর দিকে দুই হাত তোলে, তখন তা শূন্য ও নিরাশভাবে ফিরিয়ে দিতে বান্দা থেকে লজ্জা করেন।" *(আবূদাউদ ২/৭৮, তিরমিযী ৫/৫৫৭)*

তিনি বান্দার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করেন বা না করেন, দেন বা না দেন, তাতে কোন ভয় করেন না, ভয় করেন না নিন্দা বা ভর্ৎসনার। তবুও তিনি এত বড় মহানুভব যে, বান্দা হাত পাতলে, তাকে না দিতে লজ্জাবোধ করেন!

নির্লজ্জ বান্দা নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা প্রদর্শন করে, আর প্রভু তা দেখেও লোকমাঝে প্রকাশ করতে অথবা ক্ষমা না করতে লজ্জাবোধ করেন!

মহান আল্লাহ লজ্জাশীল, তবে তিনি হক বলতে ও বয়ান করতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করেন না। *(আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত ৪৩৩, ৩১৯২নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} (٢٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহ মশা কিংবা তার থেকে উচ্চ (অথবা ক্ষুদ্র) পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না। *(বাক্বারাহ ২৬ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} (٥٣) سورة الأحزاب

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে লজ্জাবোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ।" *(আহযাব ঃ ৫৩)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না'-এই আয়াতখন্ডের তফসীরে লিখেছেন,

أن يخرجكم أي لا يترك بيانه.

অর্থাৎ, তোমাদেরকে বের করার ব্যাপারে। অর্থাৎ, তিনি হক বর্ণনা বর্জন করেন না।

অথচ এ অর্থ লজ্জার পরিণামগত। তারপর এখানে যেন দুই রকম কথা বলা হয়েছে, 'তোমাদেরকে বের করতে লজ্জাবোধ করেন না', আবার 'তিনি হক বয়ান করতে লজ্জাবোধ করেন না।' সঠিক অর্থ হল শেষোক্তটি। তবে 'লজ্জা করা'র অর্থ 'বর্জন করা' করাটা ঠিক নয়। কারণ তা স্পষ্টার্থের পরিপন্থী।

মহান আল্লাহর দেখা

মহান আল্লাহ দর্শন করেন, দেখেন। সুতরাং তার ব্যাখ্যায় 'জানেন' বলা সঠিক নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} (١٤) سورة العلق

"তবে কি সে অবগত নয় যে, আল্লাহ (তার সবকিছু) দেখছেন?" *(আলাক্ব ঃ ১৪)*

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

ما صدر منه أي يعلمه فيجازيه عليه.

অর্থাৎ, (আল্লাহ দেখছেন) সে যা করছে, অর্থাৎ, তিনি জানছেন বিধায় তার উপর তাকে বদলা দেবেন।

জানাটা দেখার পরিণামগত অর্থ। কিন্তু অর্থের দিক থেকে দেখা ও জানা এক জিনিস নয়। বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহ দেখেন, এ কথা যেন অস্বীকার না করা হয়।

মহান আল্লাহ যাহের ও বাতেন

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣) الحديد

"তিনিই আদি, অন্ত, ব্যক্ত ও গুপ্ত এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (হাদীদ ঃ ৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

الظاهر: بالأدلة عليه، والباطن عن إدراك الحواس.

অর্থাৎ, তাঁর ব্যাপারে প্রমাণাদি দ্বারা তিনি ব্যক্ত এবং ইন্দ্রিয়ের অনুভব থেকে তিনি অব্যক্ত।

অথচ উচিত ছিল এর নববী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা।

আল্লাহর নবী ﷺ তাঁর দুআতে বলতেন,

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ.....

অর্থাৎ, তুমিই ব্যক্ত, তোমার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং তুমিই (সৃষ্টির গোচরে) অব্যক্ত, তোমার নিকট অব্যক্ত কিছু নেই। *(মুসলিম ৭০৬৪নং)*

এই ব্যাখ্যা দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

মহান আল্লাহর রাগ ও ক্রোধ

অসন্তোষ, রাগ, রোষ বা ক্রোধ মহান আল্লাহর একটি কর্মগত গুণ। যার ফলে তিনি ক্রোধভাজন ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন এবং তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন,

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। *(সূরা নিসা ৯৩ আয়াত)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ} (١٣) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি ক্রোধান্বিত, তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে; যেমন হতাশ হয়েছে অবিশ্বাসীরা কবরবাসীদের বিষয়ে। *(সূরা মুমতাহিনাহ ১৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ} (٢٨)

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, যা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, তারা তার অনুসরণ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে, সুতরাং তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল ক'রে দেন। *(সূরা মুহাম্মাদ ২৮ আয়াত)*

{تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} (٨٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তাদের অনেককে তুমি অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তাদের কৃতকর্ম কত নিকৃষ্ট, যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর রাগান্বিত হয়েছেন! আর তারা চিরকাল শাস্তিভোগ করবে। *(সূরা মাইদাহ ৮০ আয়াত)*

{فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} (٥٥) سورة الزخرف

অর্থাৎ, যখন ওরা আমাকে ক্রোধান্বিত করল, আমি ওদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করলাম এবং ওদের সকলকে ডুবিয়ে মারলাম। *(সূরা যুখরুফ ৫৫ আয়াত)*

কিন্তু জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) মহান আল্লাহর গযব, রাগ বা ক্রোধকে 'আযাব' দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন ঃ সূরা আ'রাফ ১৫২ আয়াত।

নিঃসন্দেহে আযাব ও শাস্তি তাঁর রাগ ও ক্রোধেরই পরিণাম। কিন্তু তা হলেও তাঁর রাগ বা ক্রোধকে অস্বীকার করা যায় না।

মহান আল্লাহর কৌশল, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র

শত্রুর নিকট থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য গোপন উপায় প্রয়োগ করলে কৌশল, ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বলা হয়। এ কাজ সাধারণভাবে মহান আল্লাহর সুন্দর গুণাবলী নয়। বরং দুশমনের মুকাবিলায় এর প্রয়োগ প্রশংসনীয়। যেহেতু তাতে তাঁর ইল্‌ম, কুদরত ও অসীম ক্ষমতার বিকাশ ঘটে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ} (١٤٢) سورة النساء

"নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন। (নিসা ঃ ১৪২)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

{ وهو خادعهم } مجازيهم على خداعهم

অর্থাৎ, তিনি তাদের প্রতারণার বদলা দিয়ে থাকেন।

{وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (٣٠) سورة الأنفال

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন অবিশ্বাসীরা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা অথবা নির্বাসিত করার জন্য। তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন। আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ। *(সূরা আনফাল ৩০ আয়াত)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

{ ويمكر الله } بهم بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج { والله خير الماكرين } أعلمهم به.

'(এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন) তোমার ব্যবস্থাপনা ক'রে, সুতরাং তাদের ষড়যন্ত্রের কথা তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাকে বের হতে (হিজরত করতে) আদেশ দিয়েছেন। (আর ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে আল্লাহ শ্রেষ্ঠ) অর্থাৎ, তিনি ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাদের চাইতে বেশি জানেন।

{وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ } (٢١) سورة يونس

"মানুষকে কোন বিপদ স্পর্শ করার পর যখন আমি তাদেরকে কোন নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করাই, তখনই তারা আমার আয়াতসমূহ সম্বন্ধে দুরভিসন্ধি (কুমতলব) করতে থাকে। তুমি বলে দাও, 'আল্লাহ দুরভিসন্ধিতে অধিক তৎপর।' নিশ্চয়ই আমার ফিরিশ্তাগণ তোমাদের সকল দুরভিসন্ধি লিপিবদ্ধ করছে।" (ইউনুস ঃ ২১)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

{ الله أسرع مكرا } مجازاة

'আল্লাহ দুরভিসন্ধিতে অধিক তৎপর।' অর্থাৎ, বদলা দিতে।

{وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ} (١٣) سورة الرعد

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; আর তিনি মহা চক্রান্তকারী (মহাশক্তিশালী)। *(সূরা রা'দ ১৩ আয়াত)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

{ وهو شديد المحال } القوة أو الأخذ

অর্থাৎ, তিনি ক্ষমতা ও পাকড়াওয়ের ব্যাপারে কঠিন।

{وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ} (٥٠) سورة النمل

অর্থাৎ, ওরা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও চক্রান্ত করলাম, কিন্তু ওরা বুঝতে পারেনি। *(সূরা নাম্‌ল ৫০ আয়াত)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

{ ومكروا } في ذلك { مكرا ومكرنا مكرا } أي جازيناهم بتعجيل عقوبتهم.

'আমিও চক্রান্ত করলাম' অর্থাৎ, সত্বর শাস্তি দিয়ে তাদেরকে বদলা দিলাম।

{إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا} (١٦) سورة الطارق

অর্থাৎ, নিশ্চয় তারা ভীষণ চক্রান্ত করে এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি। *(সূরা ত্বারিক ১৫-১৬ আয়াত)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

{ وأكيد كيدا } أستدرجهم من حيث لا يعلمون.

'আমিও ভীষণ কৌশল করি' অর্থাৎ, আমি তাদেরকে ক্রমে ক্রমে এমনভাবে পাকড়াও করি যে, তারা জানতেও পারে না!

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর সেই কৌশল ও চক্রান্তের মন্দ অর্থ নিয়ে তার অপব্যাখ্যা করা বৈধ নয়।

মহান আল্লাহর আসা

মহান আল্লাহর আসার কথা কুরআন মাজীদেই সাব্যস্ত। তিনি আসেন, যেমন তাঁর সত্তার সাথে শোভনীয়। কোন সৃষ্টির আসার মত তাঁর আসা নয়। সে আসার কোন উদাহরণও নেই। তিনি বলেন,

{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ وَقُضِيَ الأَمْرُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} (٢١٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, তারা কেবল এ প্রতীক্ষায় আছে যে, আল্লাহ মেঘের ছায়ায় ফিরিশ্তাগণসহ তাদের কাছে উপস্থিত হবেন, অতঃপর সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে। আর সব বিষয় আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হয়ে থাকে। *(সূরা বাক্বারাহ ২১০ আয়াত)*

{وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} (٢٢) سورة الفجر

অর্থাৎ, যখন তোমার প্রতিপালক আগমন করবেন আর সারিবদ্ধভাবে ফিরিশ্তাগণও (সমুপস্থিত হবে)। *(ফাজ্‌র ২২ আয়াত)*

কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহর আসার কথা হাদীসেও প্রসিদ্ধ।

বলা বাহুল্য, তাঁর আসার ব্যাখ্যা 'তাঁর নির্দেশ আসা' করা বৈধ নয়। যেহেতু তা স্পষ্ট অর্থের পরিপন্থী ও সলফদের আকীদার বিরোধী।

যেমন এ প্রশ্নও বৈধ নয় যে, তিনি আরশ-সহ আসবেন, নাকি আরশ ছেড়ে আসবেন? যেহেতু সে আসার প্রকৃতত্ব কেবল তিনিই জানেন।

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহর উপস্থিত হওয়ার তফসীরে লিখেছেন, তাঁর আদেশ বা নির্দেশ উপস্থিত হবে। শেষোক্ত আয়াতের তফসীরেও তাই লিখেছেন।

{هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ} (١٥٨) سورة الأنعام

"তারা কি এরই প্রতীক্ষা করে যে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা আসবে কিংবা তোমার প্রতিপালক আসবেন---।" (আন্‌আম ঃ ১৫৮)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের তফসীরে লিখেছেন,

أو يأتي ربك: أي علاماته الدالة على الساعة.

'তোমার প্রতিপালক আসবেন' অর্থাৎ, কিয়ামতের প্রমাণ স্বরূপ তাঁর নিদর্শনাবলী আসবে।

আসলে এ ব্যাখ্যাতে মহান আল্লাহর আসাকে অস্বীকার করা হয়। ইবনে জারীর (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন,

يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بربهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف القيامة.

মহান আল্লাহ বলছেন, যারা মূর্তি ও প্রতিমাসমূহকে তাদের প্রতিপালকের সমকক্ষ মনে করে, তারা কি এই অপেক্ষা করে যে, ফিরিশতা মৃত্যু আনয়ন ক'রে তাদের প্রাণ হরণ করবেন অথবা তাদের নিকট হে মুহাম্মাদ তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের অবস্থানক্ষেত্রে তাঁর সৃষ্টির সামনে আসবেন? *(তফসীর ত্বাবারী ৫/৪০৪)*

মহান আল্লাহর ফুৎকার করা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ} (٢٩) الحجر

{فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (٧٢) سورة ص

"যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ ফুঁকব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।' *(হিজ্‌রঃ ২৯, স্বাদঃ ৭২)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "(ফুঁকব) অর্থাৎ, জারী করব (সঞ্চালন বা চালু করব)।"

একই অর্থে বাংলা অনুবাদে লেখা হয়, 'যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।'

সম্ভবতঃ জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'ফুঁকা' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এ ব্যাখ্যা আয়াতের স্পষ্টার্থের পরিপন্থী। যেহেতু তার স্পষ্টার্থ হল, মহান আল্লাহ তাঁর রূহ আদমের মাঝে ফুঁকেছিলেন। অবশ্য তাঁর সে ফুৎকার কোন সৃষ্টির ফুৎকার বা ফুঁকার মতো নয়। বলা বাহুল্য, সঞ্চার বা সঞ্চালন করা ফুঁকার পরিণামগত অর্থ।

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ বলতে চেয়েছেন, "আমার রূহ ফুঁকব" অর্থাৎ, সেই রূহ বা প্রাণ, যার মালিক একমাত্র আমিই। আমি ছাড়া যার ব্যাপারে কেউ কোন এখতিয়ার রাখে না এবং যা ফুঁকে দিলেই এই মাটির কলেবর জীবন, নড়া-চড়ার ক্ষমতা ও দৈহিক শক্তি অর্জন করবে। মানুষের সম্মান ও মর্যাদার জন্য এ কথাই যথেষ্ট যে, তাতে সেই রূহ ফুঁকা হয়েছে, যাকে আল্লাহ তাআলা 'আমার রূহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। *(আহসানুল বায়ান)*

প্রশস্ত অর্থকে সংকীর্ণ বা সীমিত করা

তফসীরে জালালাইনের অন্যতম ত্রুটি এই যে, জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) অনেক প্রশস্ত অর্থবোধক শব্দের অর্থ বা ব্যাখ্যায় সংকীর্ণ বা সীমিত অর্থবোধক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। যেমন অনেকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অনুবাদ বিধানদাতা বা হুকুমকর্তা ক'রে থাকেন। 'ইলাহ' বা উপাস্য একটি ব্যাপক শব্দ, যার মধ্যে বিধানদাতা ও হুকুমকর্তাও শামিল আছে। কিন্তু সাময়িক প্রয়োজনে অনেকে সংকীর্ণ অর্থ গ্রহণ ক'রে প্রচার ক'রে থাকেন, যা অবশ্যই সঠিক নয়।

এ মর্মে আমরা কিছু নমুনা উল্লেখ করব। হয়তো পুরো তফসীর হতে এই শ্রেণীর ত্রুটি উল্লেখ করতে সক্ষম হব না। আশা করি বুদ্ধিমান শিক্ষক ও ছাত্র তা সহজেই অনুমান ক'রে সকল স্থানেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন।

{الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} (٧٦) النساء

"যারা বিশ্বাসী তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা অবিশ্বাসী তারা তাগূতের পথে সংগাম করে। সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। নিশ্চয় শয়তানের কৌশল দুর্বল।" (নিসাঃ ৭৬)

{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٦٠) سورة المائدة

বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহর নিকট আছে? যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূতের উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।' (মায়িদাহ ঃ ৬০)

উক্ত আয়াত দুটিতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'তাগূত'-এর তফসীরে 'শয়তান' লিখেছেন।

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} (٣٦) سورة النحل

"অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করে দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কি হয়েছে।" (নাহল ঃ ৩৬)

{وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ} (١٧) سورة الزمر

"যারা তাগূতের পূজা হতে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অনুরাগী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---" (যুমার ঃ ১৭)

উক্ত আয়াত দুটিতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'তাগূত'-এর তফসীরে 'মূর্তি' লিখেছেন।

অথচ তাগূত হল প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য, যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই 'তাগূত' বলা হয়।

এ দুনিয়ায় তাগূত বহু আছে। অবশ্য তাদের প্রধান হল পাঁচটি ঃ-

(ক) শয়তান।

(খ) আল্লাহর বিধান বিকৃতকারী অত্যাচারী শাসক।

(গ) আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছেড়ে অন্য বিধানানুসারে বিচারকর্তা শাসক।

(ঘ) আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গায়েব (গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার) দাবীদার।

(ঙ) আল্লাহর পরিবর্তে (নযর-নিয়ায, মানত, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা) যার পূজা করা ও যাকে (বিপদে) আহবান করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

"উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।" (আ'রাফ ঃ ১৮০)

{اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى} (٨) سورة طه

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।" (ত্বা-হা ঃ ৮)

{هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٢٤) سورة الحشر

"তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (হাশ্‌রঃ ২৪)

উক্ত তিনটি আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'আসমা-এ-হুসনা' (উত্তম নামসমূহ)-এর তফসীরে লিখেছেন, 'হাদীসে বর্ণিত ৯৯টি নাম।'

মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} (١١٠) سورة الإسراء

"বল, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহবান কর অথবা 'রহমান' নামে আহবান কর, তোমরা যে নামেই আহবান কর, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামাবলী। আর তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করো।" *(বানী ইস্রাঈলঃ ১১০)*

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আসমা-এ-হুসনা'র তফসীরে ইমাম তিরমিযীর ৯৯ নামের (৩৫০৭নং) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীসটি সহীহ নয়। (দ্রঃ যঃ জামে' ১৯৪৫নং)

পরন্তু মহান আল্লাহর নাম কোন নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ তাঁর দুআয় বলতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ،

عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইল্‌মে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(মুসনাদে আহমদ ১/৩৯১)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلاَّ وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)).

"নিশ্চয় আল্লাহর এমন ৯৯টি নাম রয়েছে, যে কেউ তা (দুআতে) গণনা করবে (বা মুখস্ত ক'রে তার অর্থ ও দাবী অনুযায়ী আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী, মুসলিম ২৬৭৭নং)*

এ হাদীস এ কথা বুঝায় না যে, তাঁর ৯৯টিই নাম আছে। বরং বুঝায় যে, তাঁর অনেক নাম আছে। কিন্তু তার মধ্যে ৯৯টি নাম এমন আছে, যে কেউ তা গণনা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তা না হলে বাক্যটি এরূপ হত, "নিশ্চয় আল্লাহর নাম ৯৯টি।" বুঝা গেল যে, তাঁর নামাবলী নির্দিষ্ট সংখ্যায় সীমাবদ্ধ নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ} (١) سورة البينة

"আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল, তারা আপন মতে অবিচলিত ছিল, যতক্ষণ না এল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ। (বাইয়েনাহ ঃ ১)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'মুশরিক' বলতে মূর্তিপূজকদেরকে বুঝিয়েছেন। অথচ শব্দটি আরও ব্যাপক। যেহেতু মুশরিকরা কেবল মূর্তিপূজাই করত না, বরং তাদের অনেকে নেক লোকেদের, অনেকে কবরের, অনেকে জ্বিনের, অনেকে গাছের, অনেকে পাথর ইত্যাদির পূজাও করত। পরন্তু অধিকাংশ মুশরিকরা নেক লোকেদের পূজা করত। আর নেক লোকেদের পূজা দিয়েই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম নূহ ﷺ-এর আমলে শির্ক ও প্রতিমাপূজা সংঘটিত হয়েছে।

অনুরূপ বলা যায় সূরা কাফিরূনের তফসীরে। সেখানেও তিনি উপাসনা বলতে কেবল মূর্তির উপাসনাকে সীমাবদ্ধ করেছেন।

ঈমান হল তিনটি জিনিসের সমষ্টির নাম। অন্তরে সত্যায়ন, মুখে উচ্চারণ ও কাজে বাস্তবায়ন করা। কিন্তু তিনি ঈমানের ব্যাখ্যায় কেবল 'তাসদীক্ব' বা সত্যায়নের অর্থ নিয়েছেন। (দেখুন ঃ আলে ইমরান ঃ ১৭৩, আনফাল ২, তাওবাহ ১২৪, আহযাব ২২, মুদ্দাষষির ৩১)

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (١٢) سورة لقمان

"আমি লুক্বমানকে প্রজ্ঞা দান করেছিলাম (আর বলেছিলাম), 'তুমি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা নিজেরই জন্য করে এবং কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।' (লুক্বমান ঃ ১২)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'তাঁর সৃষ্টি-নিপুণতায় তিনি প্রশংসার্হ।'

প্রকৃতপ্রস্তাবে মহান আল্লাহ প্রশংসিত, প্রশংসার্হ ও প্রশংসাকারী। যাবতীয় প্রশংসা তাঁরই। তিনি সৃষ্টির কাছে প্রশংসিত এবং তিনি প্রশংসাযোগ্য সৃষ্টিরও প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য 'হামীদ' শব্দটি 'হামেদ' ও 'মাহমূদ' উভয় অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

পরন্তু মুফাস্‌সির (রাহিমাহুল্লাহ) মহান আল্লাহকে কেবল তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্যে প্রশংসার্হ বলে সীমিত করেছেন। অথচ তিনি তাঁর সৃষ্টির সাহায্যে প্রশংসার্হ, তাঁর দ্বীন ও শরীয়তে প্রশংসার্হ ইত্যাদি। (আরো দেখুন ঃ সূরা হা-মীম সাজদাহ ৪২ আয়াত)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ} (٢٠) سورة لقمان

"তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তোমাদের অধীন ক'রে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন? মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে; তাদের না আছে জ্ঞান, না আছে পথনির্দেশ এবং না আছে কোন দীপ্তিমান গ্রন্থ।" *(লুক্বমানঃ ২০)*

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ" আয়াতের এই অংশের তফসীরে কেবল মক্কাবাসীদেরকে সীমিত করেছেন। অবশ্য সূরাটি মক্কী বলে তিনি 'মানুষ' বলতে কেবল মক্কার লোকেরাই উদ্দিষ্ট ধারণা করেছেন। অথচ সঠিক হল সকল মানুষ উদ্দিষ্ট।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا} (١١٧)

"তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে (দেবীদেরকে) আহবান করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানকে আহবান করে। *(নিসাঃ ১১৭)*

উক্ত আয়াতে এবং সূরা আনআম ৫৬, আ'রাফ ৩৭, ১৯৪, ইউনুস ৬৬, হূদ ১০১, রা'দ ১৪, নাহল ২০, বানী ইসরাঈল ৬৭, মারয়্যাম ৪৮, হজ্জ ৬২, ৭৩, আনকাবূত ৪২, ফাত্বির ১৩, ৪০, যুমার ৩৮, মু'মিন ২০, ৬৬, হা-মীম সাজদাহ ৪৮, যুখরুফ ৮৬, আহক্বাফ ৪, লুক্বমান ৩০, নং আয়াতে উল্লিখিত 'আহবান করার' ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'ইবাদত করা'র কথা লিখেছেন। অথচ ইবাদত বা উপাসনা শব্দে আহবান করা বা প্রার্থনা করার অর্থ স্পষ্ট হয় না; যদিও এগুলি এক প্রকার ইবাদত। ডাকা ও চাওয়া শব্দকে আম ইবাদত শব্দে পরিণত করা সঠিক নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}

"নিশ্চয় আল্লাহর নিকটেই আছে কিয়ামত (সংঘটিত হওয়ার) জ্ঞান, তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে। কেউ জানে না আগামী কাল সে কি অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন্

দেশে তার মৃত্যু ঘটবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।" *(লুক্বমানঃ ৩৪)*

"তিনি জানেন জরায়ুতে যা আছে" এই অংশের ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'ছেলে না মেয়ে।'

কিন্তু মহান আল্লাহ শুধু 'ছেলে না মেয়ে' এটাই জানেন না, বরং ভ্রূণের ব্যাপারে সবকিছু জানেন। যেমন পূর্ণাঙ্গ না বিকলাঙ্গ, ভাগ্যবান না হতভাগ্য, একক না জমজ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ} (٨) سورة الرعد

"প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তাঁর নিকটে প্রত্যেক বস্তুই নির্দিষ্ট পরিমাণে আছে।" (রা'দঃ ৮)

মহান আল্লাহ পরম করুণাময়। তিনি সকল সৃষ্টির প্রতি দয়াবান। মু'মিন ও কাফের সকলের জন্য তাঁর রহমত বিতড়িত আছে। তবে খাস রহমত মু'মিনদের জন্য। তাঁর ১০০টি রহমতের ১টি দুনিয়ার সকল সৃষ্টির জন্য। বাকী ৯৯টি পরকালে কেবল মু'মিনদের জন্য। আম রহমতে মু'মিন, কাফের ও জীব-জন্তু সবাই শামিল। রোদ-বৃষ্টি, রুযী, সুস্থতা প্রভৃতি নিয়ামত ও রহমতে সকলেই শামিল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ} (١٥٦) سورة الأعراف

"(মূসা বলল,) এবং আমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নির্ধারণ কর, আমরা তোমার নিকট প্রত্যাবর্তন করছি।' আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি, আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং আমি তা (দয়া) তাদের জন্য নির্ধারিত করব, যারা সাবধান হয়, যাকাত দেয় ও আমার নিদর্শনসমূহে বিশ্বাস করে। (আ'রাফ ঃ ১৫৬)

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (٧) سورة غافر

"যারা আরশ ধারণ ক'রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।" *(মু'মিনঃ ৭)*

কিন্তু জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর তফসীরের কয়েক জায়গাতে মহান আল্লাহকে কেবল তাঁর অনুগত বান্দার জন্য 'রাহীম' বলে সীমিত করেছেন। (দেখুন ঃ সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৭৩, আলে ইমরান ঃ ১২৯, নিসা ঃ ৯৬, ১৫২, সাজদাহ ঃ ৬) তাঁর আওলিয়া ও বন্ধুদের জন্য তাঁর করুণাকে সীমিত করেছেন সূরা সাবা'র ২নং আয়াতে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} (٩) الأحزاب

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝড় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার দ্রষ্টা।" *(আহযাবঃ ৯)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) এখানে 'তোমরা যা কর' বাক্যে তোমরা বলতে বিশেষভাবে খন্দক খননকারীদেরকে বুঝিয়েছেন। অথচ সঠিক হল, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যদের উদ্দেশ্যেও আম সম্বোধন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} (٣٥) سورة الأحزاب

"নিশ্চয়ই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) পুরুষ ও আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী (সংযমী) পুরুষ ও যৌনাঙ্গ হিফাযতকারী

(সংযমী) নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী---এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান রেখেছেন।" (আহ্যাবঃ ৩৫)

উক্ত আয়াতে এবং আরো অনেক আয়াতে 'ক্বানেত' শব্দের অর্থে 'অনুগত' বলা হয়। জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ)ও তাই লিখেছেন। কিন্তু আসলে উক্ত শব্দের অর্থ আরো একটু বেশি। আর তা হল, বিনয় ও একাগ্রতার সাথে অনুগত হওয়া।

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত ধৈর্যশীলদের তফসীরে তিনি লিখেছেন, 'আনুগত্যে ধৈর্যশীল'। অথচ কেবল আনুগত্য বা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনেই ধৈর্য ধারণ করতে হয়, তা নয়, বরং তাঁর তকদীর ও ফায়সালার কষ্টতেও ধৈর্য ধরতে হয়। সুতরাং আম ধৈর্যকে খাস করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا} (٤٣) سورة الأحزاب

"তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফিরিশ্তাগণও তোমাদের জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে; যাতে তিনি অন্ধকার হতে তোমাদেরকে আলোকে আনয়ন করেন। আর তিনি বিশ্বাসীদের প্রতি পরম দয়ালু।" (আহ্যাবঃ ৪৩)

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'অন্ধকার' বলতে কেবল 'কুফরী' এবং 'আলোক' বলতে কেবল 'ঈমান'কে বুঝিয়েছেন। অথচ কুফরী যেমন অন্ধকার, তেমনি অজ্ঞতাও অন্ধকার। তদনুরূপ ঈমান যেমন আলো, তেমনি জ্ঞান ও ইল্মও নূর বা আলো। সুতরাং ব্যাপক শব্দের ব্যাপক তফসীর করাই ভালো।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا} (٤٤) سورة الأحزاب

"যেদিন তারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদের প্রতি অভিবাদন হবে সালাম (শান্তি)। আর তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (আহ্যাবঃ ৪৪)

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'সালাম' বলতে 'ফিরিশতার মুখে' সালাম বুঝিয়েছেন। অথচ আয়াতে স্পষ্ট এ সালাম হবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম হবে, এ কথা তিনি অন্য আয়াতের তফসীরে উল্লেখ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلاَمٌ} (٢٣) سورة إبراهيم

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত; সেখানে তারা তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'সালাম'। (ইব্রাহীমঃ ২৩)

এখানে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে, ফিরিশতাগণের পক্ষ থেকে এবং তাদের আপোসের অভিবাদন হবে সালাম।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ

النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٥٠) سورة الأحزاب

"হে নবী! নিশ্চয় আমি তোমার জন্য তোমার স্ত্রীগণকে বৈধ করেছি, যাদেরকে তুমি মোহরানা প্রদান করেছ এবং বৈধ করেছি তোমার অধিকারভুক্ত দাসিগণকে যাদেরকে আমি যুদ্ধবন্দিনীরূপে দান করেছি এবং বিবাহের জন্য বৈধ করেছি তোমার চাচাতো ভগিনী, ফুফাতো ভগিনী, মামাতো ভগিনী ও খালাতো ভগিনীকে; যারা তোমার সঙ্গে দেশ ত্যাগ করেছে এবং কোন বিশ্বাসিনী নবীর নিকট নিজেকে নিবেদন করলে এবং নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে (সেও তোমার জন্য বৈধ।) --এ (বিধান) বিশেষ ক'রে তোমারই জন্য; অন্য বিশ্বাসীদের জন্য নয়; বিশ্বাসীদের স্ত্রী এবং তাদের দাসিগণ সম্বন্ধে যা নির্ধারিত করেছি, তা আমি জানি। (এ বিধান এ জন্য) যাতে তোমার কোন অসুবিধা না হয়। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আহ্যাবঃ ৫০)*

উক্ত আয়াতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) আয়াতের বিধান লক্ষ্য ক'রে মহান আল্লাহর ক্ষমাশীলতাকে সীমিত করেছেন কেবল 'যে বিষয় থেকে বাঁচা কঠিন' তারই মধ্যে। অনুরূপ তাঁর পরম দয়ার্দ্রতাকে সীমিত করেছেন কেবল 'এ বিষয়ে প্রশস্ততা দান করার' মধ্যে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ} (١) سورة سبأ

"প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছুরই মালিক এবং পরলোকেও সকল প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ববিষয়ে অবহিত।" (সাবা' ঃ ১)

মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা বা হিকমতকে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে কেবল তাঁর কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। অন্য আয়াতে কেবল তাঁর সৃষ্টির মধ্যে এবং কোন কোন আয়াতে তাঁর সৃষ্টির ব্যবস্থাপনার মাঝে সীমাবদ্ধ করেছেন। অথচ ব্যাপকার্থবোধক শব্দের ব্যাপক ব্যাখ্যা করাই সমুচিত। যেহেতু মহান আল্লাহ নিজ সৃষ্টি, কর্ম ও শরীয়তের বিধানে প্রজ্ঞাময়, হিকমতময় ও হাকীম।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ}

"ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ল, 'তোমরা চল এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক।" (স্বাদ ঃ ৬)

উক্ত আয়াতকে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, '(ওদের প্রধানেরা) আবূ তালেবের সাথে বৈঠক করার শেষে এবং নবী ﷺ-এর নিকট থেকে "তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল" শোনার পর (এ বলে সরে পড়ল, 'তোমরা চল এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক।)'

অথচ এ কথার কোন দলীল নেই। অতএব যা কোন বিশেষ ঘটনা বা মজলিসের সাথে বিশিষ্ট নয়, তাকে ব্যাপক রাখাই যুক্তিযুক্ত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} (٣) سورة الزمر

"জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী।" (যুমার ঃ ৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, (জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে) মূর্তিসমূহকে (অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা) মক্কাবাসীরা (বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী। (যুমার ঃ ৩)

উক্ত আয়াতে তিনি ব্যাপক গায়রুল্লাহকে কেবল মূর্তির মধ্যে এবং ব্যাপক মানবমন্ডলীকে কেবল মক্কাবাসীর মধ্যে সীমিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি তফসীরের ত্রুটি। উদাহরণ স্বরূপ তা বলা যেতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহর ব্যাপক বাণীকে শরয়ী, আকলী বা বাগ্‌ধারাগত কোন দলীল ছাড়া বিশেষ কিছুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দেওয়া সমুচিত নয়।

"ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন।" এ অংশকেও সীমিত ক'রে কেবল

মুসলিমদের মাঝে ফায়সালার কথা লিখেছেন। হয়তো তিনি ভেবেছেন, কাফেরদের মাঝে কোন মতভেদ নেই। অথচ তাদের মধ্যেও মতভেদ আছে ও থাকবে; দুনিয়াতে ও আখেরাতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لأُولاَهُمْ رَبَّنَا هَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ} (٣٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আল্লাহ বলবেন, 'তোমাদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানবদল গত হয়েছে তাদের সাথে তোমরা দোযখে প্রবেশ কর।' যখনই কোন দল তাতে প্রবেশ করবে, তখনই অপর দলকে তারা অভিসম্পাত করবে। পরিশেষে যখন সকলে ওতে একত্র হবে, তখন তাদের পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! ওরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, সুতরাং তুমি ওদেরকে দোযখের দ্বিগুণ শাস্তি দাও।' আল্লাহ বলবেন, 'প্রত্যেকের জন্য দ্বিগুণ রয়েছে; কিন্তু তোমরা জান না।' (আ'রাফ ঃ ৩৮)

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاء وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (٦٤) المائدة

"ইয়াহুদীরা বলে, 'আল্লাহর হাত সংকুচিত।' তাদের হাত সংকুচিত হোক এবং তারা যা বলে, তার জন্য তারা অভিশপ্ত হোক। বরং আল্লাহর উভয় হস্তই মুক্ত, যেভাবে ইচ্ছা তিনি দান ক'রে

থাকেন। তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। তাদের মধ্যে আমি কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করেছি। যতবার তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে, ততবার আল্লাহ তা নির্বাপিত করেন এবং তারা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ ক'রে বেড়ায়। বস্তুতঃ আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তদেরকে ভালবাসেন না।" (মায়িদাহ ঃ ৬৪)

{وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ } (١٧)

"ধর্ম সম্পর্কে ওদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান করেছিলাম। জ্ঞান আসার পর ওরা শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতবিরোধ করেছিল। ওরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করত, তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন ওদের মধ্যে সে বিষয়ের ফায়সালা ক'রে দেবেন।" (জাষিয়াহ ঃ ১৭)

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَىَ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} (١١٣) سورة البقرة

"ইয়াহুদীরা বলে, 'খ্রিষ্টানদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই' এবং খ্রিষ্টানরা বলে, 'ইয়াহুদীদের কোন (ধর্মীয়) ভিত্তি নেই'; অথচ তারা কিতাব (ঐশীগ্রন্থ) পাঠ করে। এভাবে যারা অজ্ঞ তারাও অনুরূপ কথা বলে থাকে। সুতরাং যে বিষয়ে তাদের মতভেদ আছে, শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তার মীমাংসা করবেন।" (বাক্বারাহ ঃ ১১৩)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَـذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ } (٣٠) سورة النحل

"যারা সাবধানী ছিল তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছিলেন?' তারা বলবে, 'মহাকল্যাণ।' যারা এই দুনিয়ায় সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং পরকালের আবাস আরো উৎকৃষ্টতর; আর সাবধানীদের আবাসস্থল কত উত্তম!" *(নাহলঃ ৩০)*

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ للذين أحسنوا } بالإيمان { في هذه الدنيا حسنة } حياة طيبة {ولدار الآخرة} أي الجنة { خير }

'ঈমানের সাথে (যারা এই পৃথিবীতে ইহসান করে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ) সুন্দর জীবন (এবং পরকালের আবাস) জান্নাত (আরো উৎকৃষ্টতর।) (নাহল ঃ ৩০)

নিম্নের আয়াত ও তার তফসীর লক্ষ্য করুন,

{قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} (١٠) الزمر

"ঘোষণা ক'রে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে।" (যুমার ঃ ১০)

তিনি লিখেছেন,

{ للذين أحسنوا في هذه الدنيا } بالطاعة { حسنة } هي الجنة

'আনুগত্যের সাথে (যারা এ পৃথিবীতে ইহসানী করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ) জান্নাত।

লক্ষণীয় যে, প্রথম আয়াতে ইহসান করার সাথে ঈমানকে এবং দ্বিতীয় আয়াতে ইহসান করার আনুগত্যকে সংযোজন করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত আয়াতে কল্যাণের ব্যাখ্যায় 'সুন্দর জীবন' এবং পরবর্তী আয়াতে 'জান্নাত' বলা হয়েছে।

অথচ ব্যাপককে ব্যাপক রাখা বাঞ্ছনীয় ছিল। অর্থাৎ, যারা এ দুনিয়ায় ইহসান করবে, তাদের জন্য দুনিয়াতে সুন্দর জীবন ও আখেরাতে জান্নাত রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ইহসান কীভাবে হবে? প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে ঈমান দিয়ে এবং দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে আনুগত্য দিয়ে। কিন্তু ইহসানও একটি ব্যাপকার্থবোধক শব্দ।

হাদীসে জিবরীলে ইহসান হল, মহান আল্লাহর এমনভাবে ইবাদত করা, যাতে মনে করা হয়, যেন ইবাদতকারী আল্লাহকে দেখছে। আর তা মনে না করতে পারলে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাকে দেখছেন। আর এ হল আল্লাহর জন্য ইহসান ও ইখলাস।

ইহসান হয় বান্দার প্রতিও। কায়িক, আর্থিক ও মৌখিকভাবে সৃষ্টির উপকার ক'রে সে ইহসান করা যায়। কিন্তু তফসীরে সে কথার খেয়াল রাখা হয়নি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (٢٢) سورة الزمر

"আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান---যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।" (যুমার ঃ ২২)

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) "আল্লাহর স্মরণে কঠিন"-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'কুরআন গ্রহণে কঠিন।'

অথচ এখানে 'যিক্‌র' বা স্মরণ ব্যাপক শব্দ। কুরআন ও যিক্‌র দুই অর্থই হতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (٣٣) سورة الزمر

"যে সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই তো আল্লাহ-ভীরু।" (যুমার ঃ ৩৩)

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) "যে সত্য এনেছে" বলতে মহানবী ﷺ-কে বুঝিয়েছেন। অথচ বিনা দলীলে কুরআনের ব্যাপক বর্ণনাকে সীমাবদ্ধ করা সমীচীন নয়।

দ্বিতীয়তঃ তিনি লিখেছেন এইভাবে, "যে সত্য এনেছে (তিনি হলেন নবী ﷺ) এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে (তারা হল মু'মিনগণ), তারাই তো আল্লাহ-ভীরু।"

তার মানে "সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে যে বা যারা, তাদের মধ্যে নবী ﷺ নন। অথচ দুটি বিশেষণই একই কর্তা বিশেষ্যের।

আর তিনি যদি এইভাবে লিখতেন, "যে সত্য এনেছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে (তিনি হলেন নবী ﷺ), তারাই তো আল্লাহ-ভীরু।" তাহলেও অর্থ সঠিকভাবে স্পষ্ট হতো না। কারণ, তার জবাবী বাক্য হল বহুবচন, "তারাই তো আল্লাহ-ভীরু।"

সুতরাং পরিষ্কার হল যে, আয়াতে উদ্দিষ্ট হল নবী ﷺ এবং অন্য মুসলিমরাও। প্রথমে একবচন শব্দ ব্যবহার হলেও শেষের বহুবচন শব্দ প্রথমের একবচনকে বহুবচনে পরিণত করে। এ কথা তিনি নিজেই লিখেছেন।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে সংযোজন করেছেন, 'শির্ক'। অর্থাৎ, "তারাই তো শির্ক থেকে দূরে থাকে।"

এখানেও তিনি ব্যাপকার্থবোধক শব্দকে সীমিত ক'রে ফেলেছেন।

জ্ঞাতব্য যে, 'তাক্বওয়া' শব্দ আমভাবে এলে উদ্দেশ্য হবে, আল্লাহর ভয়। অবশ্য অন্যের ভয় হলে তা উল্লিখিত হয়। যেমন,

{وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (٤٨) سورة البقرة

"তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারোর কোন কাজে আসবে না, কারোও সুপারিশ স্বীকৃত হবে না, কারোও নিকট হতে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোন প্রকার সাহায্যও পাবে না।" (বাক্বারাহ ঃ ৪৮)

{وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } (١٣١) سورة آل عمران

"তোমরা সেই আগুনকে ভয় কর, যা অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৩১)

{وَاتَّقُواْ فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٢٥) سورة الأنفال

"তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।" (আন্‌ফাল ঃ ২৫)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٦٣) سورة الزمر

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতকে (বাক্যকে) অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" *(যুমার ঃ ৬৩)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আয়াত'-এর তফসীরে 'কুরআন' লিখেছেন। অথচ আল্লাহর আয়াত বা বাক্য তাওরাত-ইঞ্জীল সহ অন্য আসমানী কিতাবেও আছে। পরন্তু আয়াত বলতে আম 'নিদর্শনাবলী' উদ্দিষ্ট হতে পারে।

অনুরূপ দেখুন ঃ সূরা হা-মীম সাজদাহ ২৮ ও ৪০ আয়াত।

সূরা নূর ৮নং আয়াতে 'আয়াত' মানে করেছেন 'আদেশ-নিষেধ'। অনুরূপ অন্য আরো আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন এবং ব্যাপক অর্থকে সংকীর্ণ করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (٥٥) سورة غافر

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(মু'মিন ঃ ৫৫)*

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ নিজ নবীকে আমভাবে সকাল-সন্ধ্যায় তসবীহ পড়তে আদেশ করেছেন। কিন্তু তফসীরে নামায পড়ার কথা বলা হয়েছে।

অনুরূপভাবে সূরা হা-মীম সাজদার ৩৮নং আয়াতে ফিরিশতাগণের 'তসবীহ'কে নামায বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সূরা নূরের ৩৬নং আয়াতের 'তসবীহ'কে নামায বলা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আল-কুরআনের অনেক আয়াতে তসবীহ বলতে নামাযকে বুঝানো হয়েছে। যেমন,

{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (١٧) وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ} (١٨) سورة الروم

"সুতরাং তোমরা সন্ধ্যায় ও ভোর সকালে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং বিকালে ও দুপুরে। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তাঁরই।" (রূম ঃ ১৭- ১৮)

অনেক উলামা বলেছেন, উক্ত আয়াতে ৫ অক্তের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হাদীসে নফল বা সুন্নত নামাযকে 'তাসবীহ' বলা হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ এক সফরে লোকেদেরকে ফরয নামাযের পর সুন্নত পড়তে দেখে বললেন,

صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ.

'আমি নবী ﷺ-এর সাথে সফরে থেকেছি। আমি তাঁকে সুন্নত পড়তে দেখিনি। যদি আমাকে সুন্নতই পড়তে হত, তাহলে ফরয নামায পুরা করেই পড়তাম।' *(মুসলিম ১৬১২নং)*

كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يسبحُ على الراحلة أيَ وجه تَوَجـهَ، ويوتر عليها؛ غير أنه لا يصلي المكتوبة عليها.

তিনি আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে নিজের সওয়ারীর উপর যে মুখে উট চলত, সেই মুখেই নফল ও বিত্‌র নামায পড়তেন। *(বুখারী ১০৯৮, মুসলিম ১৬৫২, মিশকাত ১৩৪০ নং)*

চাশ্তের নামাযকে 'সুবহাতুয যুহা' বলা হয়েছে। *(আহমাদ ৬৬৩৮, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৬৬৮নং)*

কিন্তু সকল আয়াতে বা সকল ক্ষেত্রে 'তসবীহ' 'নামায' নয়। অতএব অকারণে আমকে খাস করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } (٧٠) غافر

"ওরা গ্রন্থ ও আমার রসূলদেরকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছিলাম, তা মিথ্যাজ্ঞান করে। সুতরাং শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে।" (মু'মিন ঃ ৭০)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'কিতাব' বা 'গ্রন্থ' বলতে কুরআনকে এবং মিথ্যাজ্ঞানকারী বলতে মক্কাবাসীকে সীমিত করেছেন।

অথচ অনেকে কুরআন ছাড়া তাওরাত ও ইঞ্জীলকেও মিথ্যাজ্ঞান ক'রে থাকে। আর মক্কার মানুষ ছাড়াও অন্য লোকেরা অনুরূপ মিথ্যাজ্ঞানে শামিল আছে। সুতরাং অর্থ সীমাবদ্ধ করা বাঞ্ছনীয় নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٩) سورة فصلت

"বল, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাবে? তিনি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালক।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৯)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'রব্ব'(প্রতিপালক)-এর অর্থে 'মালিক' (অধিপতি) লিখেছেন। অথচ যিনি প্রতিপালক, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, অধিপতি ও ব্যবস্থাপক। সুতরাং ব্যাপকতা ছেড়ে সীমিত অর্থ গ্রহণ করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (١٢) سورة فصلت

"অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ১২)

জেনে রাখা ভালো যে, 'আল-আযীয' মানে কেবল পরাক্রমশালীই নয়। উলামাগণ বলেছেন, 'আযীয' হয় তিন প্রকার ঃ-

এক ঃ ইয্যত-ওয়ালা, সম্মানী, মর্যাদাবান।

দুই ঃ পরাক্রমশালী, বিজয়ী।

তিন ঃ অপরাজেয়, দুর্দম।

এক স্থলে একক শব্দ দ্বারা হয়তো তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ} (٢٩) سورة فصلت

"কাফেররা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যে সব জ্বিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দাও, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে ওরা লাঞ্ছিত হয়।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ২৯)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'এ কথা কাফেররা দোযখে বলবে।'

অথচ কিয়ামতের ময়দানেও তারা এ কথা বলতে পারে।

অনুরূপ 'জ্বিন' বলতে ইবলীস ও 'মানুষ' বলতে কাবীলকে নির্ধারণ করেছেন। যেহেতু প্রথমজন কুফরী ও দ্বিতীয়জন হত্যার সূচনা ঘটিয়েছে।

অথচ সঠিক হল, অনির্দিষ্টভাবে জ্বিন ও মানুষ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} (٣٠) سورة فصلت

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'ফিরিশতাগণ এ কথা মৃত্যুর সময় বলেন।' অথচ সঠিক হল, অর্থকে এমন সীমাবদ্ধ করা বৈধ নয়। যেহেতু এ কথা মু'মিনদের বিপদাপদ, ভয়-ভীতি বা যুদ্ধের সময়ও হতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٣٣) سورة فصلت

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি?" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)*

তফসীরে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর প্রতি' মানে 'তাওহীদের প্রতি'। অথচ এ অর্থ সীমিত। তওহীদ, সালাত ও বিভিন্ন সৎকর্মাদি-সহ আম দ্বীনের দিকে আহবান আয়াতের শামিল। এই জন্য অনেকে বলেছেন, উক্ত আহবায়ক হল মুআয্যিন, যে নামাযের দিকে মানুষকে আহবান করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٤٠)

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহে বক্রপথ অবলম্বন করে, তারা আমার অগোচর নয়। যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে সে শ্রেষ্ঠ; না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদে উপস্থিত হবে সে? তোমাদের যা ইচ্ছা কর, নিশ্চয় তোমরা যা কর, তিনি তার দ্রষ্টা।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪০)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'আয়াত' বলতে কেবল কুরআনকে নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন পূর্বে আলোচিত

হয়েছে, এমনটা করা বাঞ্ছনীয় নয়। অনুরূপভাবে 'ইলহাদ' বা বক্রপথ অবলম্বন করার ব্যাখ্যায় তিনি কেবল 'মিথ্যায়ন'কে নির্ধারণ করেছেন। আর সেটাও সঠিক নয়। কারণ, শরয়ী আয়াতে 'ইলহাদ' হয় তিনভাবে ঃ মিথ্যায়ন ক'রে, বিকৃত ক'রে অথবা বিরোধিতা ক'রে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) فصلت

"নিশ্চয় যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।) আর এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪১-৪২)*

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কুরআনকে 'আযীয' বলেছেন। আর তার ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) কেবল এক প্রকার অর্থ উল্লেখ করেছেন। অথচ পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, 'আযীয' হয় তিন প্রকার ঃ-

এক ঃ ইয্যত-ওয়ালা, সম্মানী, মর্যাদাবান। অনুবাদে 'মহিমময়' বলা হয়েছে।

দুই ঃ পরাক্রমশালী, বিজয়ী।

তিন ঃ অপরাজেয়, দুর্দম।

তিনি শেষোক্ত অর্থের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অবশ্য পরবর্তী আয়াত তাঁর কথার সমর্থন করে। তবুও জেনে রাখা উচিত যে, এ কিতাব যেমন অপরিবর্তনীয়। যেহেতু মহান আল্লাহ তার সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্‌রঃ ৯)

অর্থাৎ, কুরআনে অবৈধ হস্তক্ষেপ, বিকৃতি সাধন ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে রক্ষা করা আমার দায়িত্ব। অতএব কুরআন সেইভাবেই আজও সুরক্ষিত আছে, যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছিল। ভ্রষ্ট ফির্কাগুলো নিজ নিজ আকীদার সর্মথনে কুরআনের আয়াতের আর্থিক বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং আজও ঘটাচ্ছে। তবে শাব্দিক বিকৃতি ও পরিবর্তন হতে তা এখনও সুরক্ষিত। *(আহসানুল বায়ান)*

তেমনই এ কিতাব বিজয়ী ও যুগান্তকারী। এই কুরআন ও তার আখলাক নিয়ে মহানবী ﷺ ও তাঁর অনুসারিগণ সকল ধর্ম ও জাতির মানুষের উপরে বিজয়ী হয়েছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ}

"তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন।" *(তাওবাহ ঃ ৩৩, ফাত্‌হ ঃ ২৮, স্বাফ্‌ ঃ ৯)*

তবে আজ কুরআনের উম্মাহ পরাজিত ও পরাভূত কেন?

উত্তর অতি সহজ। যেহেতু উম্মাহ সে কুরআন থেকে বহু দূরে সরে এসেছে এবং তার ব্যাপারে নানা মতভেদ সৃষ্টি ক'রে নিজেরা দলে-দলে শতধাবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আজ কুরআনের জন্য রসূল ﷺ-এর সেই অভিযোগ সত্য হয়েছে, যার কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (٣٠)

"রসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।" (ফুরক্বান ঃ ৩০)

তাঁরা বিশ্বে সর্বোপরি ছিলেন সঠিকভাবে কালজয়ী কুরআন মান্য ক'রে। আজ তাঁদের উত্তরসূরিগণ লাঞ্ছিত ও পদদলিত হয়েছে সেই কুরআন বর্জন ক'রে।

'বিশ্বে যারা ছিল সেরা হয়ে মুসলমান,
আজি তারা লাঞ্ছিত ছাড়িয়া কুরআন।'

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (٥٣) سورة النـور

"ওরা দৃঢ়ভাবে আল্লাহর শপথ ক'রে বলে যে, তুমি ওদেরকে আদেশ করলে ওরা জিহাদের জন্য অবশ্যই বের হবে। তুমি বল, 'শপথ করো না। তোমাদের আনুগত্য তো জানাই আছে। তোমরা যা কর, আল্লাহ অবশ্যই সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (নূর ঃ ৫৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) আয়াতের শেষাংশের তফসীরে ব্যাপক অর্থকে সংকীর্ণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, তোমাদের সেই আমল সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত, যা তোমরা কথায় আনুগত্য ও কাজে বিরোধিতারূপে করছ।

অথচ ব্যাপককে ব্যাপক রাখাই আবশ্যক। অবশ্য সকল কর্মের মধ্যে তাদের ঐ কাজও শামিল, যা আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (٣٧) سورة النـور

"এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে।" (নূর ঃ ৩৭)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'তিজারত' (ব্যবসা-বাণিজ্য)-এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'ক্রয়'। তিনি ব্যবসার মতো এত ব্যাপক শব্দকে কেবল 'ক্রয়' করার মধ্যে সীমিত করেছেন। কারণ তার পরেই সংযোজিত শব্দ এসেছে 'বাই', আর তাতে আছে 'বিক্রয়'-এর অর্থ। অথচ সঠিক হলে 'বাই' শব্দেও 'ক্রয়'-এর অর্থ আছে। 'বাই' শব্দের সঠিক অর্থ ক্রয়-বিক্রয় উভয়ই। সুতরাং তাঁর উক্ত সীমিতকরণের কোন অর্থ থাকছে না।

তাছাড়া মানুষ কেবল ক্রয়-বিক্রয় নিয়েই আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত থাকে না, বরং পণ্য সাজাতে-গুছাতে, সংরক্ষণ করতে, গণনা ও হিসাব ইত্যাদি করতে গিয়েও বিরত থাকতে পারে এবং উদাসীন হতে পারে। বলা বাহুল্য, কুরআনের ব্যাপক অর্থকে সংকীর্ণ অনুধাবন-ফ্রেমে বন্দী করা উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} (١٩) سورة النـــور

"যারা বিশ্বাসীদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" (নূর ঃ ১৯)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'অশ্লীলতার প্রসার' কে মৌখিক প্রসারে সীমাবদ্ধ করেছেন। অথচ তা না ক'রে ব্যাপক রাখা জরুরী। অনুরূপ এই শাস্তি কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট নয়, যাদের অপবাদ প্রচারের জন্য আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। বরং এর বিধান কিয়ামত পর্যন্ত সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আয়াত অবতীর্ণের কারণ খাস হলেও, তার বিধান আম থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦٣) سورة النـــور

"সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে।" (নূর ঃ ৬৩)

উক্ত আয়াতের তফসীরে 'ফিতনা' বা বিপর্যয় বলতে 'বালা-মসীবত' ধরা হয়েছে এবং কঠিন শাস্তি পরকালে গ্রাস করবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকাশ যে, এখানেও ব্যাপক অর্থকে সংকীর্ণ অর্থের বোতলে বন্দী করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} (٣٣)

"যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে।" *(নূর ঃ ৩৩)*

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'বিবাহের সামর্থ্য' বলতে কেবল আর্থিক সামর্থ্যই নয়। কারণ অনেকের আর্থিক সামর্থ্য আছে, কিন্তু বিবাহের পাত্রী পাচ্ছে না, তারাও কিন্তু সংযম অবলম্বন করবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء} (٤٥) سورة النـور

"আল্লাহ সমস্ত জীবজন্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" *(নূর ঃ ৪৫)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'অর্থাৎ, বীর্য থেকে।'

অথচ সকল প্রকার জীব-জন্তুর জন্ম বীর্য থেকে নয়। যেহেতু বহু পোকা বা কীট আছে, যাদের জন্ম হয় আর্দ্র নোংরা থেকে। সুতরাং তফসীরে পানিকে 'পানি' রাখাই সঙ্গত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ} (٣٥) الروم

"আমি কি ওদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি, যা ওদেরকে আমার কোন অংশী স্থাপন করতে বলে?" (রূম ঃ ৩৫)

উক্ত আয়াতে 'বলা' বলতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) রূপকার্থে অবস্থার বলাকে বুঝিয়েছেন। অথচ সে বলা আরো ব্যাপক। আল্লাহর কালাম, আল্লাহ বলেন এবং কুরআন বলে ও বয়ান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}

"নিশ্চয়ই এ কুরআন বনী-ইস্রাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, তার অধিকাংশের বৃত্তান্ত তাদের নিকট বিবৃত করে।" (নাম্‌ল ঃ ৭৬)

যেমন কিয়ামতে মানুষের আমলনামা কথা বলবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٢٩)

"আমার (নিকট সংরক্ষিত) এ আমলনামা, যা তোমাদের ব্যাপারে সত্য কথা বলবে। তোমরা যা করতে, নিশ্চয় আমি তা লিপিবদ্ধ করাতাম।" (জাষিয়াহ ঃ ২৯)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (٣٠) الإنسان

"তোমরা ইচ্ছা করবে না; যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (দাহর ঃ ৩০)

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "তোমরা (আনুগত্যের পথ অবলম্বনের) ইচ্ছা করবে না, যদি না (তা) আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" যেহেতু তার পূর্বের আয়াতে আছে, "নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।" (দাহর ঃ ২৯)

অথচ আয়াতের অর্থ ব্যাপক। সকল ইচ্ছার ব্যাপারেই মহান আল্লাহর ইচ্ছা অবশ্যই হতে হবে। সুতরাং কেবল আনুগত্যের পথ অবলম্বনের ব্যাপারে তাঁর ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়।

অতঃপর আয়াতের শেষাংশে লিখেছেন, "প্রজ্ঞাময় (তাঁর কর্মে)।" বলা বাহুল্য, এখানেও তাঁর হিকমতকে কেবল তাঁর কর্মের ভিতরে সীমিত করেছেন। অথচ তিনি তাঁর সৃষ্টিতে, কর্মে, বিধানে, প্রতিদানে, শাস্তি দানে, ভাগ্য নির্ধারণে, সব কিছুতেই তিনি প্রজ্ঞাময়। অবশ্য এ সব কিছুকে যদি তাঁর এক-একটা কর্ম বলা হয়, তাহলে আলাদা কথা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ} (٤) السجدة

"আল্লাহ; যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হন। তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (সাজদাহ ঃ ৪)

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "তাঁর বিরুদ্ধে (হে মক্কাবাসী!) তোমাদের কোন অভিভাবক অথবা সুপারিশকারী নেই; তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?"

বলা বাহুল্য, এ সম্বোধন কেবল মক্কাবাসীর জন্য নয়, বরং তা সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য।

এ ছিল ব্যাপককে সীমাবদ্ধ ক'রে তফসীর করার কিছু নমুনা। পাঠক উক্ত তফসীরে এই শ্রেণীর আরো উদাহরণ পাবেন। উদ্দেশ্য আপনাকে সতর্ক করা, যাতে ভুল ধারণায় পতিত না হন।

কতিপয় বেঠিক ব্যাখ্যার নমুনা

তফসীরের অনেক স্থানে এমন ব্যাখ্যা আছে, যা সঠিক নয়। প্রমাণিত নয় অথবা যুক্তিযুক্ত নয়। পাঠক একটু মনোযোগী হলেই তা বুঝতে পারবেন। এখানে কিছু নমুনা দেওয়া হল ঃ-

{وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ } (٣٤) سورة البقرة

"যখন ফিরিশ্তাদেরকে বললাম, 'আদমকে সিজদাহ কর।' তখন সকলেই সিজদাহ করল; কিন্তু ইবলীস সিজদাহ করল না; সে অমান্য করল ও অহংকার প্রদর্শন করল। সুতরাং সে অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হল।" (বাক্বারাহ ঃ ৩৪)

উক্ত আয়াত এবং অনুরূপ সূরা আ'রাফ ঃ ১১, হিজ্র ঃ ২৯, বানী ইসরাঈল ঃ ৬১, কাহফ ঃ ৫০, স্বাদ ঃ ৭২নং আয়াতের তফসীরে আদমকে সিজদা করার পদ্ধতির ব্যাপারে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'অভিবাদনমূলক ঝুঁকে সিজদা, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা নয়।'

সিজদার সে আদেশ ছিল অভিবাদনমূলক এবং ইবাদতমূলক ছিল না, সে কথা সুনিশ্চিত। কিন্তু তা যে মাটিতে হাত-পা-কপাল রেখে পরিচিত সিজদা ছিল না, তা সঠিক নয়। কারণ সিজদার আসল অর্থই হল সাষ্ঠাঙ্গে প্রণিপাত। আর কোন কোন আয়াতে স্পষ্ট ক'রে বলা হয়েছে, "সিজদায় পতিত হও।" অর্থাৎ, মাটিতে কপাল রেখে সিজদা কর।

এ সিজদা মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ না হলেও তাঁরই আদেশে তা আবশ্যিক ছিল। আর মহান আল্লাহ যা আদেশ করেন, তা পালন করা ইবাদত; যদিও তা অন্য স্থলে হারাম। যেমন মানুষ হত্যা করা হারাম। কিন্তু মহান আল্লাহর আদেশে ইবরাহীম ﷺ-এর জন্য তা ছিল ইবাদত। দন্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাসকদের জন্য তা বিধেয়।

বলা বাহুল্য, আদমের জন্য সে সিজদা কেবল মাথা ঝুঁকিয়ে ছিল এবং মাটিতে কপাল রেখে ছিল না, এ কথা বলার কোন প্রয়োজন ছিল না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ} (١٥) المائدة

"হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। (মায়িদাহ ঃ ১৫)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) জ্যোতির ব্যাখ্যাতে লিখেছেন, 'মুহাম্মাদ ﷺ।' কিন্তু কাতাদাহ থেকে বর্ণিত এ তফসীর যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ,

১। আয়াতের শুরুতেই রসূল ﷺ-এর কথা বলা হয়েছে। "আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে।" তাহলে আবার নতুন করে 'মুহাম্মাদ এসেছে' বলার যৌক্তিকতা থাকে না।

২। আয়াতে উল্লিখিত 'নূর' বা 'জ্যোতি' হল কুরআন। 'ওয়াও' (হারফে আত্বফ) দিয়ে পৃথক করা হলেও ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়নি, এখানে ব্যাখ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। উক্ত 'নূর'-এর ব্যাখ্যা হল, 'কিতাবুম মুবীন'। তার প্রমাণ পরবর্তী আয়াত,

{يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ} (١٦) سورة المائدة

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন।" *(মায়িদাহঃ ১৬)*

লক্ষণীয় যে, 'বিহী' যমীর (সর্বনাম) একবচন ব্যবহৃত হয়েছে। নচেৎ 'নূর' অর্থে নবী হলে 'বিহিমা' দ্বিবচন যমীর ব্যবহার হতো।

বহু জায়গায় মহান আল্লাহ কুরআনকে 'নূর' বলেছেন। যেমন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا}

"হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট নূর (জ্যোতি) অবতীর্ণ করেছি।" *(নিসাঃ ১৭৪)*

উক্ত আয়াতেও 'নূর' বলতে কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। 'অবতীর্ণ করা' সেই কথারই তাকীদ করে। যেহেতু নবী পাঠানো হয়েছে, অবতীর্ণ করা হয়নি। কুরআনই অবতীর্ণ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে 'নূর' মানে 'নবী' করলেও, এ থেকে প্রমাণ হয় না যে, নবী নূর থেকে সৃষ্ট। কারণ সে নূর রূপক অর্থের তাঁর নবুঅতের নূর হতে পারে। যেমন জ্ঞানের নূর, যা দৃশ্যমান নয়।

পরন্তু এ আলো, জ্যোতি বা নূর থেকে উদ্দেশ্য আল-কুরআন।

উদ্দেশ্য নবী ﷺ নয়। অন্য আয়াতে তার ব্যাখ্যা রয়েছে,

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٨)

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" *(তাগাবুনঃ ৮)*

যদি এ সত্ত্বেও কেউ বলে, রসূলকেই জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, তাহলে নিম্নের আয়াত প্রনিধানযোগ্য,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম। *(আ'রাফঃ ১৫৭)*

বলা বাহুল্য, কুরআন হল আধ্যাত্মিক নূর, যা আলোকরূপে দৃশ্যমান

নয়। অনুরূপ নবী ﷺ-কে 'নূর' মানলেও আধ্যাত্মিক নূর। দৃশ্যমান নূর আদৌ নয় এবং তিনি নূর থেকে সৃষ্ট, তাও নয়। আর এতে তাঁর সম্মান বিন্দু পরিমাণ হ্রাস হয় না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٦١)

"অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য, রুগ্ণের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের জন্য তোমাদের নিজেদের গৃহে আহার করা দূষণীয় নয় অথবা তোমাদের পিতৃগণের গৃহে, মাতৃগণের গৃহে, ভ্রাতৃগণের গৃহে, ভগিনীগণের গৃহে, পিতৃব্যদের গৃহে, ফুফুদের গৃহে, মাতুলদের গৃহে, খালাদের গৃহে অথবা সে সব গৃহে যার চাবি তোমাদের হাতে আছে অথবা তোমাদের বন্ধুদের গৃহে; তোমরা একত্রে আহার কর অথবা পৃথক্ পৃথক্ভাবে আহার কর, তাতে তোমাদের জন্য কোন অপরাধ নেই; তবে যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমরা তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এ হবে আল্লাহর নিকট হতে কল্যাণময় ও পবিত্র অভিবাদন। এভাবে তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত করেন; যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (নূর ঃ ৬১)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, অর্থ হল, উল্লিখিত সকলের গৃহে আহার করা বৈধ; যদিও তারা উপস্থিত না থাকে। অর্থাৎ, যখন খাওয়াতে তাদের সম্মতি আছে, সে কথা জানা যাবে।

কিন্তু 'যখন খাওয়াতে তাদের সম্মতি আছে, সে কথা জানা যাবে।' এ শর্ত আরোপ করা সঠিক নয়। যেহেতু যখন বাড়ি-ওয়ালার খাওয়ার ব্যাপারে সম্মতি আছে জানা যাবে, তখন উল্লিখিত স্বজনদের বাড়িতে খাওয়ার মাঝে এবং অন্যান্য লোকেদের বাড়িতে খাওয়ার মাঝে পার্থক্য কী থাকবে?

অতএব সঠিক হল এই যে, উল্লিখিত সকলের গৃহে আহার করা বৈধ; যদিও তারা উপস্থিত না থাকে। অর্থাৎ, যখন খাওয়াতে তাদের অসম্মতি আছে, সে কথা জানা না যাবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٣٩)

"যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকার ন্যায়; পিপাসার্ত যাকে পানি মনে ক'রে থাকে। কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখে তা কিছুই নয় এবং সেখানে সে আল্লাহকে পায়। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দান করেন। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর।" (নূর ঃ ৩৯)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "সেখানে সে আল্লাহকে পায়।" অর্থাৎ, তার আমলের নিকট।

অথচ সঠিক হল, মরীচিকার নিকট আল্লাহকে পায়। কারণ স্পষ্টার্থে যমীর নিকটবর্তী উল্লিখিত শব্দের প্রতি ইঙ্গিত করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} (٤١) سورة النـــور

"তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।" (নূর ঃ ৪১)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "সকলেরই প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার কথা আল্লাহ জানেন।" যেহেতু আয়াতের শেষাংশ এই অর্থের ইঙ্গিত বহন করে।

অথচ সঠিক হল, আয়াতে 'জানা' ক্রিয়ার কর্তা 'আল্লাহ' নন। বরং আকাশ-পৃথিবীর সকলে নিজ নিজ 'সালাত ও তাসবীহ' জানে। যেহেতু মহান আল্লাহ সকলের মধ্যে তার জ্ঞান প্রক্ষিপ্ত করেছেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ} (٤٧) سورة النـــور

"ওরা বলে, আমরা আল্লাহ ও রসূলে ঈমান রাখি এবং আমরা আনুগত্য করি; কিন্তু এরপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুতঃ ওরা মু'মিন নয়।" (নূর ঃ ৪৭)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে এবং আরো অন্য আয়াতে 'ঈমান' মানে কেবল 'তাসদীক' (সত্যায়ন) করেছেন। কিন্তু তাতে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। যেহেতু ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও আমলে পরিণত করার নাম। কেবল সত্যায়ন বা সত্যজ্ঞান করা

ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। এই জন্য আবূ তালেব মু'মিন ছিলেন না, অথচ তিনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সত্যজ্ঞান করেছিলেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا } (٢١) سورة الفرقان

"যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না, তারা বলে, 'আমাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখি না কেন?' ওরা ওদের অন্তরে অহংকার পোষণ করেছে এবং ওরা গুরুতররূপে সীমালংঘন করেছে।" *(ফুরক্বানঃ ২১)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতে উল্লিখিত "যারা আমার সাক্ষাৎ কামনা করে না"-এর তফসীরে লিখেছেন, "পুনরুত্থানকে ভয় করে না।"

অথচ কামনা বা আশা শব্দকে ভয় বা আশঙ্কা শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অবশ্য তার প্রকৃতার্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হলে আলাদা কথা। আর এখানে আসল অর্থ গ্রহণে কোন সমস্যাই নেই। কারণ অর্থ হল, আল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর সাক্ষাৎ ও দর্শন কামনা কাফেরদের থাকে না।

{تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا}

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" *(ফুরক্বানঃ ৬১)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ وجعل فيها } أيضا { سراجا } هو الشمس { وقمرا منيرا } وفي قراءة سرجا بالجمع : أي نيرات وخص القمر منها بالذكر لنوع فضيلة.

"ওতে (আরো) স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" অন্য এক ক্বিরাত অনুযায়ী 'সিরাজান' একবচনের জায়গায় 'সুরুজান' বহুবচন আছে। অর্থাৎ, উজ্জ্বল প্রদীপমালা। অতঃপর বিশেষভাবে চাঁদকে উল্লেখ করা হয়েছে, তার এক প্রকার মাহাত্ম্যের জন্য।

তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রদীপমালার মধ্যেই চাঁদ আমভাবে শামিল ছিল। কিন্তু 'আত্‌ফ' বা সংযোজন ক'রে পৃথকভাবে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে তার অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যের জন্য। অথচ এ ধারণা সঠিক নয়। বরং প্রদীপমালা থেকে চাঁদ পৃথক তাই তাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু চাঁদ প্রদীপ নয়, তার নিজস্ব কোন আলো নেই। যেমন মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}

"তিনিই সেই সত্তা যিনি সূর্যকে দীপ্তিমান ও চন্দ্রকে আলোকময় বানিয়েছেন এবং ওর (গতির) জন্যে কক্ষসমূহ নির্ধারিত করেছেন, যাতে তোমরা বছরসমূহের সংখ্যা ও (সময়ের) হিসাব জানতে পার। আল্লাহ এসব বস্তু অযথা সৃষ্টি করেননি, তিনি জ্ঞানবান সম্প্রদায়ের জন্য এই সমস্ত নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন।" (ইউনুস ঃ ৫)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} (٧٢) الفرقان

"(তারাই পরম দয়াময়ের বান্দা) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার ক'রে চলে।" (ফুরক্বান ঃ ৭২)

উক্ত আয়াতে 'অসার ক্রিয়াকলাপ' বলতে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'জঘন্য কথা'কে বুঝিয়েছেন। অথচ উদ্দেশ্য হল, প্রত্যেক সেই কথা বা কর্ম, যাতে কোন প্রকারের উপকার নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ} (٥٨) سورة الروم

"আমি তো মানুষের জন্য এ কুরআনে সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তুমি যদি ওদের নিকট কোন নিদর্শনও উপস্থিত কর, তাহলে অবিশ্বাসীরা অবশ্যই বলবে, 'তোমরা তো মিথ্যাশ্রয়ী।" (রূম ঃ ৫৮)

উক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'লায়্যাক্বুলান্না' শব্দের ব্যাপারে লিখেছেন, একাধিক নূন একত্রিত হওয়ার কারণে নূনুর রফ্‌ই বাদ দেওয়া হয়েছে। তদনুরূপ দুই সাকেন একত্রিত হওয়ার কারণে বহুবচনের যমীর ওয়াও বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, ليقولَن আসলে ليقولونن ছিল। অথচ এ ধারণা ভুল। কারণ ليقولَن একবচন ক্রিয়া, আর তার কর্তা হল الذين। তাঁর নহবী বিশ্লেষণ সঠিক হতে হলে শব্দটি ليقولُنَّ না হয়ে ليقولَنَّ হতো।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢٧) سورة لقمان

"পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষ যদি কলম হয় এবং এ যে সমুদ্র এর সাথে যদি আরও সাত সমুদ্র যুক্ত হয়ে কালি হয়, তবুও আল্লাহর বাণী (লিখে) শেষ হবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(লুক্বমানঃ ২৭)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, '(আল্লাহর বাণী শেষ হবে না) অর্থাৎ, উক্ত পরিমাণ কালি ও কলম বা তারও বেশি কালি-কলম দ্বারা লিখে তাঁর জ্ঞানভান্ডার শেষ হবে না। যেহেতু তাঁর জ্ঞানভান্ডার অন্তহীন।'

বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর বাণী বলতে তাঁর জ্ঞানভান্ডার বুঝা সলফগণের বুঝের পরিপন্থী এবং স্পষ্ট শব্দ থেকে দূরে সরে অর্থ গ্রহণের নামান্তর। যেমন অন্যত্র এ কথা উল্লিখিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ} (٣٠) سورة لقمان

"এগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহই ধ্রুব সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে, তা বাতিল। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই সুউচ্চ, সুমহান।" *(লুক্বমানঃ ৩০)*

তফসীরে বলা হয়েছে, "এগুলি প্রমাণ করে যে, আল্লাহই ধ্রুব সত্য এবং ওরা তাঁর পরিবর্তে যাকে ডাকে (ইবাদত করে), তা বাতিল (নশ্বর)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তিনিই সুউচ্চ, সুমহান।"

'বাতিল' এমন কিছুকে বলে, যাতে কোন কল্যাণ নেই। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا شَاعِرٌ كَلِمَةُ لَبِيدٍ : أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلاَ اللهَ بَاطِلُ)).

"সবচেয়ে সত্য কথা যা কোন কবি বলেছেন, তা হল লাবীদ (কবির) কথা, (তিনি বলেছেন,) 'শোনো, আল্লাহ ছাড়া সব কিছুই বাতিল।" *(বুখারী ৩৮৪১নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (٨) سورة السجدة

"অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেছেন।" (সাজদাহঃ ৮)

তফসীরে 'সুলালাহ' শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'আলাক্বাহ' দিয়ে। অথচ কোন জিনিসের সারনির্যাসকে 'সুলালাহ' বলা হয়; জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) নিজে এ কথা বলেছেন সূরা মু'মিনূন ১২নং আয়াতের তফসীরে। আর 'আলাক্বাহ' বলা হয় বীর্যের পরবর্তী অবস্থার রক্তপিন্ডকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (١٤) سورة السجدة

"সুতরাং তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। কারণ, আজকের এ সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে। আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেছি। তোমরা যা করতে তার জন্য তোমরা চিরকালের শাস্তি ভোগ করতে থাক।" (সাজদাহঃ ১৪)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'এ কথা জাহান্নামের রক্ষীরা বলবে, যখন ওরা তাতে প্রবেশ করবে।'

অথচ বাক্যের সাথে বক্তার সামঞ্জস্য হয় না। বলা বাহুল্য, উক্ত উক্তি মহান আল্লাহর। তিনিই তাদেরকে এ কথা বলবেন; যেমন পূর্বের আয়াতের উক্তিও তাঁরই।

{وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (١٣) سورة السجدة

"আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। কিন্তু আমার এ কথা যথার্থ সত্য, আমি নিশ্চয়ই মানব ও দানব উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সাজদাহঃ ১৩)

আর ভুলে যাওয়া বা বিস্মৃত হওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ} (٦٧) سورة التوبة

"তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন।" (তাওবাহঃ ৬৭)

{وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ} (٣٤) سورة الجاثية

"ওদেরকে বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।" (জাষিয়াহঃ ৩৪)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (٥) سورة الأحزاب

তোমরা ওদেরকে পিতৃপরিচয়ে ডাক; আল্লাহর দৃষ্টিতে এটিই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা ওদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে ওদেরকে তোমরা ধর্মীয় ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য কর। যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের

আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (আহযাবঃ ৫)

উক্ত আয়াতের শেষাংশের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "(যে কথা তোমরা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্বে বলেছ, তার জন্য) আল্লাহ ক্ষমাশীল, (এতে তোমাদের প্রতি) পরম দয়ালু।"

অথচ তাঁর তফসীর সঠিক বলে মনে হয় না। কারণ, কোন নির্দেশ জারী হওয়ার আগে তার বিপরীত করলে কোন পাপ হয় না বা তাতে পাকড়াও হয় না। সুতরাং তার ব্যাপারে ক্ষমাশীলতা প্রদর্শনের কোন মানে হয় না। অতএব সঠিক তফসীর হল এই যে, "(যে কথা তোমরা নিষিদ্ধ হওয়ার পরে ভুলবশতঃ বলেছ, তার জন্য) আল্লাহ ক্ষমাশীল, (আর নিষিদ্ধ হওয়ার পরে ভুলবশতঃ পাপ পাকড়াও না করার ব্যাপারে তিনি তোমাদের প্রতি) পরম দয়ালু।"

আরো বলা যায় যে, "আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" ভুলবশতঃ বা ইচ্ছাকৃত উভয় পাপকর্মের ব্যাপারে। অতঃপর ভুলবশতঃ কৃত পাপ পাকড়াও না করার ব্যাপারে তিনি অতি করুণাময়। আর ইচ্ছাকৃত পাপ মাফ করার ব্যাপারে তিনি মহা ক্ষমাশীল। সঠিকভাবে তওবা করলে মহান প্রভু তাঁর বান্দাকে ক্ষমা ক'রে দেন।

অনুরূপ দেখুনঃ সূরা নিসা ২৩নং আয়াত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} (٢٧) سورة ص

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এ তো অবিশ্বাসীদের ধারণা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।" (স্বাদঃ ২৭)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের 'ওয়াইল' নামক উপত্যকা।"

অথচ এ আয়াতে উক্ত শব্দ ধমকের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} (٢٢) سورة الزمر

"আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন ফলে সে তার প্রতিপালক হতে (আগত) আলোর মধ্যে আছে, সে কি তার সমান-- যে এরূপ নয়? দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে কঠিন, ওরাই স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে।" (যুমার ঃ ২২)

উক্ত আয়াত এবং আরো অনেক আয়াতে উল্লিখিত 'ওয়াইল' শব্দের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'আযাবের শব্দ' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সঠিক হল শব্দটি ধমকের শব্দ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ } (٢٤) سورة الزمر

"যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমন্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে (সে কি তার মত, যে নিরাপদ?) সীমালংঘনকারীদের বলা হবে, তোমরা যে কর্ম করতে তার শাস্তি আস্বাদন কর।" (যুমার ঃ ২৪)

উক্ত আয়াতে 'কঠিন শাস্তি'র ব্যাখ্যা করেছেন 'সবচেয়ে কঠিন শাস্তি' বলে। অথচ আয়াতে سوء العذاب আছে, أسوأ العذاب ইসমে তাফযীলের শব্দ নেই। নিঃসন্দেহে তফসীরে এটি অতিরঞ্জন হয়ে গেছে, যা বাঞ্ছনীয় ছিল না।

অনুরূপভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ঐ ব্যক্তিকে তার গর্দানের সাথে হাত বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অথচ এর ইঙ্গিত কুরআনে নেই। সম্ভবতঃ তিনি ধারণা করেছেন যে, তার হাত বাঁধা না থাকলে মুখের বদলে সে নিজ হাত দ্বারাই কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইত।

কিন্তু এমন ধারণা সঠিক নাও হতে পারে। কারণ এমনও হতে পারে যে, তার হাত খোলা থাকবে, কিন্তু সে তার দ্বারা আযাব ঠেকাতে সক্ষম হবে না অথবা সে ধারণা করবে যে, মুখ দ্বারা ঠেকানো বেশি ফলপ্রসূ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (٣٦) سورة آل عمران

"অতঃপর যখন সে (ইমরানের স্ত্রী) ওকে (সন্তান) প্রসব করল, তখন সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি, বস্তুতঃ আল্লাহ সম্যক অবগত সে যা প্রসব করেছে। আর (ঐ কাঙ্ক্ষিত) পুত্র তো (এ) কন্যার মত নয়, আমি তার নাম মারয়্যাম রেখেছি এবং অভিশপ্ত শয়তান হতে তার ও তার বংশধরদের জন্য তোমার পানাহ দিচ্ছি।' (আলে ইমরান ঃ ৩৬)

উক্ত আয়াত এবং সূরা আনআম ঃ ১১৭, ইউসুফ ঃ ৭৭, নাহল ঃ ১২৫, ক্বাস্বাস ঃ ৩৭, ৫৬, ৮৫, আনকাবূত ঃ ১০, যুমার ঃ ৭০, নাজ্ম ঃ ৩০, ৩২ ও ক্বালাম ঃ ৭নং আয়াতে উল্লিখিত 'আ'লাম' শব্দের ব্যাখ্যায় জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) 'আলেম' লিখেছেন।

অথচ 'আ'লাম' ইসমে তাফযীলের শব্দ 'আলেম' অপেক্ষা বেশি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। যেহেতু আলেম মানে জ্ঞানী, কিন্তু আ'লাম মানে

সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। সুতরাং নিঃসন্দেহে এটি তফসীরের একটি ত্রুটি।

যদি বলেন, 'আল্লাহ সবার চেয়ে জ্ঞানী' বলা হলে অন্যকেও জ্ঞানী মানা হয় এবং তাকে তাঁর সাথে তুলনা করা হয়। তাহলে আমরা বলব, তাতে ক্ষতি কী? স্বয়ং জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) কুরআনের 'আরহাম, আহকাম, খাইরুর রাহিমীন, খাইরুল হাকিমীন' প্রভৃতি শব্দে অন্যের সাথে তুলনা করেই 'অন্যের চাইতে বেশি' অর্থ ক'রে তুলনামূলক শব্দে তফসীর করেছেন। তাহলে 'আ'লাম' শব্দের তফসীরে কেন এমন বাধা এল? 'আলীম, আল্লাম, আ'লাম' ইত্যাদি শব্দে যে অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া যায়, তা কি 'আলেম' শব্দে আছে? তাহলে মহান আল্লাহ 'আলেম' শব্দ ব্যবহার না ক'রে 'আ'লাম' শব্দ কেন ব্যবহার করলেন?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ} (٧٣) الزمر

"আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।" (যুমারঃ ৭৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) উক্ত আয়াতের তফসীর করেছেন, "আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করত, তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা জান্নাতের নিকট

উপস্থিত হবে (তখন তারা তাতে প্রবেশ করবে) এবং জান্নাতের দরজা (ইতিপূর্বে) খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের প্রতি সালাম (শান্তি), তোমরা সুখী হও এবং স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য জান্নাতে প্রবেশ কর।"

তাঁর মতে জান্নাতীদের জান্নাতের দরজায় পৌঁছনোর আগে তাদের সম্মানার্থে তা খুলে রাখা হবে। অথচ এমন দাবীর কোন দলীল নেই। বরং তাঁর দাবীর বিপরীতেই দলীল আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(أنا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلْقَةِ بابِ الجَنَّةِ فَأُقَعْقِعُهَا).

অর্থাৎ, আমিই হব সেই ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজার কড়া ধরে হিলাবে। *(আহমাদ ২৬৯২, তিরমিযী ৩১৪৮, দারেমী ৫০নং)*

(وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ).

অর্থাৎ, আমিই হব সেই ব্যক্তি, যে সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। *(আহমাদ ১২৪৯১, সিঃ সহীহাহ ১৫৭১নং)*

(وَلَدُ آدَمَ كُلُّهُمْ تَحْتَ لِوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُفْتَحُ لَهُ بَابُ الجَنَّةِ).

"কিয়ামতের দিন আদম-সন্তানদের সকলেই আমার পতাকাতলে অবস্থান করবে এবং আমিই হব সেই ব্যক্তি, যার জন্য সর্বপ্রথম জান্নাতের দরজা খোলা হবে।" *(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৭১১৮নং)*

« آتِى بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ فَيَقُولُ الْخَازِنُ مَنْ أَنْتَ فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لأَحَدٍ قَبْلَكَ ».

"আমি জান্নাতের নিকট এসে তার দরজা খুলতে বলব। দারোয়ান ফিরিশ্‌তা বলবেন, 'কে আপনি?' আমি বলব, 'মুহাম্মাদ।' দারোয়ান বলবেন, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি, যেন আপনার পূর্বে অন্য কারো জন্য

দরজা না খুলি।" *(মুসলিম ৫০৭নং)*

তাহলে জান্নাতীদের সম্মানার্থে জান্নাতের দরজা আগে থেকেই খুলে রাখা হবে---এই দাবী যথার্থ নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ} (৩৫) سورة غافر

"যারা নিজেদের নিকট আগত কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয় --তাদের এ কাজ আল্লাহ এবং বিশ্বাসীদের নিকট অতিশয় অসন্তোষের বিষয়। এই মতো আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর ক'রে দেন।" *(মু'মিনঃ ৩৫)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) তফসীর করেছেন, "এই মতো (ওদের ভ্রষ্ট করার মতো) আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর ক'রে দেন।"

অথচ সঠিক হল, "এই (মোহর করার মতো) আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর ক'রে দেন।"

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَـقٌّ وَاسْـتَغْفِرْ لِـذَنبِكَ وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ بِالْعَـشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (৫৫) سورة غافر

অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। *(মু'মিনঃ ৫৫)*

উক্ত আয়াত এবং সূরা মুহাম্মাদ ১৯ এবং (অনুরূপ ফাত্হ ২)নং আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর" (যাতে তোমার সুন্নত বা আদর্শ পালিত হয়।)

অর্থাৎ, তোমার ক্ষমাপ্রার্থনা দেখে লোকেরা ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং এতে তোমার আদর্শ তারা গ্রহণ করে। জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) যেন ইঙ্গিত করেছেন যে, নবী ﷺ যেহেতু নিষ্পাপ। সেহেতু তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলার সেই অর্থই হবে।

নবীগণ নিষ্পাপ হন, এতে কোন সন্দেহ নেই। সেই ভুল, যাতে পাপ হয়, সে ভুল থেকেও মহানবী ﷺ মুক্ত ছিলেন। তাহলে মহান আল্লাহ কেন বলেছেন,

{فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّـهِ حَـقٌّ وَاسْـتَغْفِرْ لِـذَنبِكَ وَسَـبِّحْ بِحَمْـدِ رَبِّـكَ بِالْعَـشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (৫৫) سورة غافر

"অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর; নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর তুমি তোমার পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" *(মু'মিনঃ ৫৫)*

{فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ} (১৯)

"সুতরাং তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া (সত্য) কোন উপাস্য নেই। আর ক্ষমা-প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের ত্রুটির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং অবস্থান ক্ষেত্র সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন।" *(মুহাম্মাদঃ ১৯)*

{لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَـأَخَّرَ وَيُـتِمَّ نِعْمَتَـهُ عَلَيْـكَ وَيَهْـدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} (٢) الفتح

"যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ মার্জনা করেন এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন ও তোমাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" *(ফাত্হঃ ২)*

কেন মহানবী ﷺ দিনে সত্তরের বেশি অথবা এক শতবার ক'রে ইস্তিগফার করতেন?

নবী করীম ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর শপথ! আমি প্রত্যহ আল্লাহর কাছে সত্তর বারেরও বেশি ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও তাওবাহ করে থাকি।" *(বুখারী ৬৩০৭নং)*

"আমার অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে নিমেষভর বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেহেতু আমি দিনে একশত বার আল্লাহর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাই।" *(মুসলিম ৭০৩৩নং)*

তাঁর পূর্বাপর সকল গোনাহকে ক্ষমা করা হয়েছে সাহাবাগণ সে কথা তাঁকে বলতেন।

কোন আমল করতে বললে এবং সাহাবাগণ তার চাইতে বেশি করতে চাইলে মহানবী ﷺ তাঁদেরকে নিষেধ করতেন। তখন সাহাবাগণ বলতেন, 'আমরা তো আপনার মতো নই হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(বুখারী ২০নং)*

এক ব্যক্তি এসে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! অপবিত্র থাকা অবস্থায় ফজরের নামাযের সময় হয়ে যায়, তাহলে আমি কি রোযা রাখব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« وَأَنَا تُدْرِكُنِى الصَّلاَةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ ».

"(হ্যাঁ,) আমারও অপবিত্র অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে যায়, অতঃপর আমি রোযা রাখি।"

লোকটি বলল, 'আপনি তো আমাদের মতো নন হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তো আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(মুসলিম ২৬৪৯নং)*

কিয়ামতে কষ্টের সময় সুপারিশের জন্য লোকেরা নবীগণের কাছে যাবে। তারা সকলের প্রশংসা করে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করতে বলবে। তারা মহানবী ﷺ-এর প্রশংসা করে বলবে, 'আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।' *(বুখারী ৪৭১২, মুসলিম ৫০১নং)*

উবাইদ বিন উমাইর ﷺ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় ঘটনা কী দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'এক রাত্রে (নবী ﷺ) আমাকে বললেন, "আয়েশা! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য ছেড়ে দাও।" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য চাই এবং তাই চাই, যা আপনাকে আনন্দ দান করে।' সুতরা তিনি উঠে ওযূ করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে ছিলেন, (চোখের পানিতে) তাঁর কোল ভিজে গেল। তারপরও কাঁদতে লাগলেন। (সিজদায় গেলে অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল! (ফজরের আগে) বিলাল নামাযের খবর দিতে এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন!' তিনি বললেন, "আমি কি (আল্লাহর) শুক্‌রগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে তা পড়েছে,

অথচ তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেনি।

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

(١٩١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর। *(আলে ইমরানঃ ১৯০-১৯১, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৪৬৮নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ রাতে (এত দীর্ঘ) কিয়াম করতেন যে, তাঁর পা দুখানি (ফুলে) ফেটে (দাগ পড়ে) যেত। একদা আমি তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এরূপ কাজ কেন করছেন? আল্লাহ তো আপনার আগের ও পিছের সমস্ত পাপ মোচন ক'রে দিয়েছেন।' তিনি বললেন, "আমি কি তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পছন্দ করব না?" *(বুখারী ৪৮৩৭, মুসলিম ৭৩০৪নং)*

মুগীরাহ বিন শু'বাহ কর্তৃক অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। *(বুখারী ১১৩০, মুসলিম ৭৩০২নং)*

মহানবী ﷺ-এর 'পাপ' বলতে এমন ছোট-খাটো ভুল-চুক যা মানবীয় দুর্বলতা অনুযায়ী ঘটে যায় এবং যেগুলোর সংশোধনও মহান আল্লাহর পক্ষ হতে ক'রে দেওয়া হয়।

মহানবী ﷺ-এর 'অতীত ও ভবিষ্যতের ত্রুটিসমূহ'-এর অর্থ, এমন

সব বিষয়াদি, যা ত্যাগ করাই উত্তম অথবা এমন সব জিনিস, যা তিনি ﷺ স্বীয় জ্ঞান, অনুমান ও প্রচেষ্টার আলোকে করেছেন, কিন্তু আল্লাহ তা পছন্দ করেননি। যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ﷺ-এর ঘটনা; যার উপর সূরা 'আবাসা' অবতীর্ণ হল।

"সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। তোমাকে কিসে জানাবে? হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল সভয় মনে, তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে! কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)।" *(আবাসাঃ ১-১২)*

একদা নবী ﷺ-এর নিকট কুরাইশ (কাফের)দের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বসে কথা-বার্তা বলছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ উক্ত আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ﷺ উপস্থিত হলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। আসা মাত্র নবী ﷺ-কে দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর প্রতি কিছুটা বিরক্তিভাব পোষণ করলেন এবং তার প্রতি অমনোযোগী হলেন। এটা মহান আল্লাহর অপছন্দনীয় ছিল। তাই সতর্কতাস্বরূপ সূরা আবাসার ঐ আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। *(তিরমিযী ৩৩৩১নং)*

অনুরূপ একটি ঘটনা, কিছু লোক জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি চাইলে মহানবী ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। আল্লাহর ইচ্ছায় অনুমতি না দেওয়াটাই সঠিক ছিল। মহান আল্লাহ তাই তাঁকে সতর্ক করে বললেন,

{عَفَا اللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ

الْكَاذِبِينَ} (٤٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। তোমার নিকট সত্যবাদী স্পষ্ট ও মিথ্যাবাদী জ্ঞাত হওয়ার পূর্বে তুমি তাদেরকে অনুমতি কেন দিলে? *(তাওবাহঃ ৪৩)*

মহানবী ﷺ-কে সম্বোধন করে বলা হলো যে, জিহাদে শরীক না হওয়ার অনুমতি প্রার্থীদেরকে তাদের ওজর সত্য ছিল কি না, তা তদন্ত করে না দেখে কেন অনুমতি দিয়ে দিলে? কিন্তু এই তিরস্কারেও স্নেহের প্রভাব বেশী ছিল। এই জন্য উক্ত ত্রুটির ক্ষমার কথা প্রথমেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

জেনে রাখা দরকার যে, এই তিরস্কার এই জন্য করা হয়েছে যে, অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ার সাথে কাজ নেওয়া হয়েছে এবং পূর্ণভাবে সত্যতা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। নচেৎ তদন্তের পর যার সত্যই ওজর আছে তাকে অনুমতি দেওয়ার ব্যাপারে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন তিনি বলেছেন, {فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} "অতএব তারা তোমার কাছে তাদের কোন কাজের অনুমতি চাইলে তুমি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুমতি দাও।" *(নূর ঃ ৬২)* 'যাকে ইচ্ছা' মানে হল, যার কাছে সত্যিকারে ওজর আছে, তাকে অনুমতি দেওয়ার অধিকার তোমার রয়েছে। *(আহসানুল বায়ান)*

অনুরূপ আরো একটি ঘটনা, বদর যুদ্ধে ৭০ জন কাফের মারা পড়ল এবং ৭০ জন বন্দী হল। এটা কাফের ও মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ছিল। এই জন্য যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী ধরনের আচরণ করা যেতে পারে এ ব্যাপারে পূর্ণরূপে কোন বিধান স্পষ্ট ছিল না। সুতরাং নবী ﷺ সেই ৭০ জন বন্দীদের ব্যাপারে সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন যে, কী করা

যাবে? তাদেরকে হত্যা করা হবে, না কিছু মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হবে? বৈধতা হিসাবে এই দু'টি রায়ই সঠিক ছিল। সেই জন্য উক্ত দু'টি রায় নিয়ে বিবেক-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলেন। কিন্তু কখনো কখনো বৈধতা ও অবৈধতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কাল-পাত্র ও পরিস্থিতি বুঝে অধিকতর উত্তম পন্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন হয়। এখানেও অধিকতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৈধতাকে সামনে রেখে অপেক্ষাকৃত কমতর কল্যাণকর পন্থা অবলম্বন করা হল। যে ব্যাপারে সতর্ক করে আল্লাহ তাআলার তরফ হতে ভর্ৎসনাস্বরূপ আয়াত অবতীর্ণ হল। উমার ﷺ প্রভৃতিগণ নবী ﷺ-কে এই পরামর্শ দিলেন যে, কুফ্‌রের শক্তি ও প্রতাপকে ভেঙ্গে ফেলা দরকার আছে। এই জন্য বন্দীদেরকে হত্যা করা হোক। কেননা, এরা হল কুফ্‌র ও কাফেরদের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। এরা মুক্তি পেলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অধিকরূপে চক্রান্ত চালাবে। পক্ষান্তরে আবু বাক্‌র ﷺ প্রভৃতিগণ উমার ﷺ-এর রায়ের বিপরীত রায় পেশ করলেন যে, তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ (বিনিময়) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হোক। আর ঐ মাল দ্বারা আগামী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হোক। নবী ﷺ এই রায়কে প্রাধান্য দিলেন। তখন এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَّوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ اللّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (٦٨) الأنفال

অর্থাৎ, দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং

আল্লাহ চান পরলোকের কল্যাণ। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান (লিপিবদ্ধ) না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ, তার জন্য তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হত। *(আনফাল ঃ ৬৭-৬৮)*

(حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْض) এর মতলব হল, যদি দেশে কুফ্‌রের আধিপত্য হয় (যেমন, সেই সময় আরবে কুফরের আধিপত্য ছিল), তাহলে এ অবস্থায় বন্দী কাফেরদেরকে হত্যা করে তাদের শক্তির মাথাকে চূর্ণ করে ফেলা আবশ্যক। সুতরাং তোমরা এই সূক্ষ্ম নীতিকে দৃষ্টিচ্যুত করে যে মুক্তিপণ (বিনিময়) গ্রহণ করলে, তার মানে হল অধিকতর উত্তম পন্থা বর্জন করে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের পন্থা অবলম্বন করলে; যা তোমাদের ভুল এখতিয়ার। আর তার জন্য মহান আল্লাহ উক্ত সতর্কবাণী অবতীর্ণ করলেন।

আনসারদের যাফার গোত্রের ত্বো'মা অথবা বাশীর ইবনে উবাইরিক্ব নামক এক ব্যক্তি অপর এক আনসারীর বর্ম চুরি ক'রে নেয়। যখন এই চুরির চর্চা হতে লাগল এবং যখন সে অনুভব করল যে, তার চুরির কথা ফাঁস হয়ে যাবে, তখন সে (চুরিকৃত) বর্মটা এক ইয়াহুদীর বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাফার গোত্রের কিছু লোককে সাথে নিয়ে রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। সকলে মিলে বলল যে, বর্মটা অমুক ইয়াহুদী চুরি করেছিল। সেই ইয়াহুদীও নবী করীম ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, ইবনে উবাইরিক্ব বর্ম চুরি ক'রে আমার বাড়িতে ফেলে দিয়েছিল। যাফার গোত্রের লোকেরা (ত্বো'মা অথবা বাশীর প্রভৃতি) প্রথম থেকেই সতর্ক ছিল। তারা নবী করীম ﷺ-কে বুঝাতে চেষ্টা করছিল যে, চোর ইয়াহুদীই; ত্বো'মার উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম ﷺ তাদের চমৎকার ও চতুরতাপূর্ণ কথাবার্তায়

প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন এবং আনসারীকে চুরির অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা ক'রে ইয়াহুদীকে চুরির অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করতে যাবেন, ঠিক এই সময়ই মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا}

অর্থাৎ, তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (নিসা ঃ ১০৫)

এ থেকে যে বিষয়গুলো জানা গেল তা হল ঃ-

প্রথমতঃ নবী করীম ﷺ একজন মানুষ বিধায় তিনি ভুল বোঝাবুঝির শিকার হতেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি গায়েব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখতেন না। গায়বের খবর জানলে তিনি সত্বর তাদের প্রকৃত ব্যাপার জেনে নিতেন।

তৃতীয়তঃ মহান আল্লাহ স্বীয় পয়গম্বরের হিফাযত করেন। তাই কখনোও যদি প্রকৃত ব্যাপার গুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে নবীর দ্বারা (সত্যের) বিপরীত কিছু হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে পৌঁছত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে নবীকে সতর্ক ক'রে তাঁর সংশোধন ক'রে দিতেন। আর এটাই হল নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার মূল রহস্য। এ এমন এক উচ্চ মর্যাদা যা আম্বিয়া ব্যতীত আর কেউ লাভ করতে পারে না।

এই ত্রুটির জন্যই মহান আল্লাহ তাঁর রসূল ﷺ-কে বললেন,

{وَاسْتَغْفِرِ اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (١٠٦) سورة النساء

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তুমি ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(নিসাঃ ১০৬)*

কোন তদন্ত না ক'রে খিয়ানতকারীদের যেহেতু তুমি সমর্থন করেছ, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উভয় দলের মধ্যে কোন এক পক্ষের সত্যতার ব্যাপারে পূর্ণ নিশ্চয়তা না হওয়া পর্যন্ত তার সমর্থন করা এবং তার হয়ে ওকালতি বা প্রতিনিধিত্ব করা বৈধ নয়। তাই মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-কে নির্দেশ দিলেন,

{وَلاَ تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا} (١٠٧) النساء

অর্থাৎ, তুমি তাদের পক্ষে কথা বলো না, যারা নিজেদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না। *(নিসাঃ ১০৭)*

উপর্যুক্ত ভুল আচরণ ও কর্মগুলি যদিও কোন পাপ নয় এবং মহানবী ﷺ-এর নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থী কাজ ছিল না, তবুও তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা হিসাবে এগুলিকেও ত্রুটি ও কমি গণ্য করা হয়েছে এবং এরই উপর ক্ষমার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু বলা হয় যে,

(حَسَنَاتُ الأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْن).

অর্থাৎ, নেক লোকদের নেকী, নৈকট্যপ্রাপ্তদের বদী।

এমন অনেক কাজ আছে, যা আম লোকেদের জন্য করা বৈধ। কিন্তু তা খাস লোকেদের জন্য ত্রুটি বলে গণ্য হয়। আর তাই হয়েছে নবীগণের ক্ষেত্রে। *(আরো দ্রঃ 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ')*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُون} (٨٣) سورة غافر

"ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রসূলগণ এল, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করল। আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।" *(মু'মিনঃ ৮৩)*

উক্ত আয়াতের তফসীরে জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات } المعجزات الظاهرات { فرحوا } أي الكفار { بما عندهم } أي الرسل { من العلم } فرح استهزاء وضحك منكرين له { وحاق } نزل { بهم ما كانوا به يستهزئون } أي العذاب

"ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলী (স্পষ্ট মু'জিযা)সহ ওদের রসূলগণ এল, তখন ওরা (কাফেররা রসূলগণের) জ্ঞান নিয়ে প্রত্যাখানবশতঃ ব্যঙ্গ ও হাসিভরা দম্ভ প্রকাশ করল। ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।"

আসলে তিনি আয়াতের শেষ অংশের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে খোশ হয়ে দম্ভ করার মানে ব্যঙ্গ ও হাসি-ঠাট্টা করেছেন।

অথচ আয়াতের সঠিক অর্থ হল, কাফেরদের নিকট রসূলগণ নিদর্শনাবলী-সহ এলে, তারা নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করল এবং তা নিয়ে মনে মনে খোশ হয়ে গর্বিত হল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (١٢) سورة فصلت

"অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং তাকে করলাম সুরক্ষিত। এ সব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।" *(হা-মীম সাজদাহঃ ১২)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিণত করলেন" অর্থাৎ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে। এই (জুমআর) দিনের শেষ মুহূর্তে সপ্তাকাশ সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন এবং এই মুহূর্তেই আদমকে সৃষ্টি করলেন।

এই তফসীর থেকে ধারণা হয় যে, মহান আল্লাহ যে ছয় দিনে সপ্তাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, সেই ছয় দিনেরই শেষ দিনে শুক্রবারের শেষ সময়ে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। অথচ এমন ধারণা সঠিক নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ আদমকে পৃথিবীর বুকে খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (٣٠) سورة البقرة

"(স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জান না।" (বাক্বারাহঃ ৩০)

তার মানে আদমের আগে জিন প্রভৃতি জাতি পৃথিবীতে বসবাস করেছে। আর নিশ্চয় তা আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টির বহুকাল পরে; একই সময়কালে নয়।

অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আদম ﷺ-কে জুমআর দিনেই সৃষ্টি করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)).

"যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বেহেশ্ত থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে।" *(মুসলিম ২০১৩নং)*

((خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الجِبَالَ يَومَ الأَحَدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَومَ الاِثْنَين ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَومَ الثُّلاَثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَربِعَاءِ ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوابَّ يَومَ الخَمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ مِنْ يَومِ الجُمُعَةِ فِي آخِرِ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا بَيْنَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ)).

"আল্লাহ তাআলা শনিবার যমীন সৃষ্টি করেছেন, রবিবার তার মধ্যে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছেন। সোমবার সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা। মঙ্গলবার মন্দ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। বুধবার আলো সৃষ্টি করেছেন। তাতে (যমীনে) জীবজন্তু ছড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার। আর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করার পর পরিশেষে জুমআর দিন আসরের পর দিনের শেষভাগে আসর ও রাতের মাঝামাঝি সময়ে (আদি পিতা) আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করেছেন।" *(মুসলিম ৭২৩১নং)*

তবে আদম-সৃষ্টির জুমআ, আকাশ-পৃথিবী-সৃষ্টির জুমআ নয়। লক্ষণীয় যে, আদম সৃষ্টির দিনগুলিতে ৭ দিনের উল্লেখ রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}

"সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" *(হা-মীম সাজদাহঃ ৪২)*

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه) أي ليس قبله كتاب يكذبه ولا بعده (تنزيل من حكيم حميد) .

অর্থাৎ, এর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন কিতাব এর মিথ্যায়ন করেনি।

লক্ষণীয় যে, আল-কুরআনের পরবর্তী কোন আসমানী কিতাবই নেই, তাহলে তার মিথ্যায়ন করার কোন প্রসঙ্গই থাকতে পারে না।

আসলে আয়াতের সঠিক অর্থ হল, বাতিল, অসার বা মিথ্যা কিছু এ কিতাবে স্থান পেতে পারে না।

তার সম্মুখ হতে কোন বাতিল আসতে পারে না, অর্থাৎ যে বিষয়ে সে খবর দিচ্ছে তার মধ্যে।

তার পশ্চাৎ হতে কোন বাতিল আসতে পারে না, মানে যে বিষয়ে সে খবর দিয়েছে।

এ কিতাব অতীতের যে খবর দিয়েছে, তা হক ও সত্য এবং ভবিষ্যতের যে খবর দিয়েছে, তাও হক ও সত্য।

মোট কথা, এ কিতাবের খবর ও বিধানে কোন বাতিল বা অসত্য কিছু নেই। কোনভাবেই এতে মিথ্যা প্রক্ষিপ্ত হয়নি, হবেও না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ} (٤٣) سورة فصلت

"তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয়, যা বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণ সম্পর্কে। তোমার প্রতিপালক অবশ্যই ক্ষমাশীল এবং কঠিন শাস্তিদাতা।" (হা-মীম সাজদাহঃ ৪৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "তোমার সম্বন্ধে তো তেমনই বলা হয়, যেমন বলা হত তোমার পূর্ববর্তী রসূলগণ সম্পর্কে।"

তাঁর মতানুসারে বুঝা যাচ্ছে যে, শেষনবী ﷺ-কে যা বলা হয়, তা হুবহু পূর্ববর্তী নবীগণকে বলা হয়নি। বরং তার অনুরূপ কিছু বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের শব্দ বলছে, পূর্ববর্তী রসূলগণকে যে কথাই বলা হয়েছে, সে কথাই শেষ রসূল ﷺ-কে বলা হচ্ছে; যদিও ভিন্ন ভাষায়। আর এই স্পষ্টার্থ গ্রহণে কোন বাধাও নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٥٢) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ} (٥٣) سورة الذاريات

"এভাবে, তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই তারা বলেছে, '(তুমি তো এক) যাদুকর, না হয় পাগল!' তারা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।" (যারিয়াত ঃ ৫২-৫৩)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (٧٨) لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٧٩) سورة الواقعة

"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৭-৭৯)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ إنه } أي المتلو عليكم { لقرآن كريم، في كتاب } مكتوب { مكنون } مصون وهو المصحف { لا يمسه } خبر بمعنى النهي { إلا المطهرون } الذين طهروا أنفسهم من الأحداث.

"নিশ্চয়ই এটা (যা তোমাদের নিকট পঠিত হচ্ছে তা) সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে (লিখিত, আর তা হল মুসহাফ)। (যারা নিজেদের অপবিত্রতাসমূহ থেকে নিজেদেরকে পবিত্র রেখেছে, সেই) পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" (এটি খবর নিষেধের অর্থে। অর্থাৎ, করবে না।)

এটি একটি তফসীর। অর্থাৎ, উল্লিখিত কুরআন বলতে পৃথিবীর বুকে কাগজের কুরআন এবং স্পর্শকারী হল মানুষ। কিন্তু এ তফসীর অনেক সাহাবী, তাবেঈ ও মুফাস্‌সিরীনের তফসীরের পরিপন্থী। যেমন ঃ-

১। "যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে।" অর্থাৎ, সম্মানিত সুরক্ষিত কিতাবে সসম্মানে। (ইবনে কাষীর)

২। "পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" অর্থাৎ, যে কিতাব আসমানে (লওহে মাহফূযে) আছে। এ কথা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে।

৩। "পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" অর্থাৎ, ফিরিশ্‌তাগণ। এ কথাও ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত।

৪। "পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।

কিন্তু দুনিয়াতে (যে কুরআন আছে) তা অপবিত্র অগ্নিপূজক ও মুনাফিকও স্পর্শ করে। এ কথা কাতাদাহ হতে বর্ণিত আছে।

৫। ইবনে যায়দ বলেছেন, কুরাইশের কাফেররা মনে করত, শয়তানেরা এ কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছে। তাই মহান আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, "পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" যেমন তিনি বলেছেন,

{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} (٢١٢)

"শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি। ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না। অবশ্যই ওদেরকে শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়েছে।" (শুআ'রা ঃ ২১০-২১২)

ইবনে কাষীর বলেছেন, 'এটি একটি ভালো উক্তি। পূর্বোক্ত উক্তিগুলি থেকে পৃথক নয়।'

৬। শায়খ আব্দুর রায্যাক আফীফী উক্ত আয়াতের (মাহাল্লী) তফসীরের টীকায় বলেছেন, 'সঠিক হল, সেটা লওহে মাহফূয। আর পূত-পবিত্রগণ হলেন ফিরিশ্‌তাবর্গ।

উদ্দেশ্য হল, বিকৃতকারীদের হাত হতে কুরআনকে সুরক্ষিত রাখা। এ আয়াতে বিনা উযূতে কুরআন স্পর্শ হারাম হওয়ার দলীল নেই। বরং এ ব্যাপারে ভিত্তি হল কিছু হাদীস; যদি তা সহীহ হয়।

৭। শায়খ মুহাম্মাদ বিন উষাইমীন (রাহিমাহুল্লাহ) এক রেডিও প্রোগ্রামে বলেছেন, যদি المطهرون দ্বারা উদ্দিষ্ট তারা হতো, যারা নিজেদেরকে অপবিত্রসমূহ হতে পবিত্র রাখে, তাহলে المتطهرون বলা

হতো। যেহেতু ফিশ্‌তাগণ হলেন مطهرون। আর তাঁরা ছাড়া যারা অপবিত্র হয়, তারা পবিত্র হলে বলা হয় متطهرون।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} (٧٤) سورة الواقعة

"সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৪)

উক্ত আয়াত এবং সূরা হা-ক্কাহ ৫২ ও সূরা আ'লা ১নং আয়াতের তফসীরে বলা হয়েছে, 'ইস্‌ম' শব্দটি অতিরিক্ত। অর্থাৎ, অর্থে ধর্তব্য নয়। তার মানে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, "সুতরাং তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের --- পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।"

অথচ সঠিক হল, 'ইস্‌ম' বা নাম শব্দটি আয়াতে বাড়তি ও ফালতু নয়। যেহেতু যেমন মহান আল্লাহর সত্তার পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে, তেমনি তাঁর নামের পবিত্রতাও ঘোষণা করতে হবে। আর তা হবে ঃ-

(ক) যে সকল নাম কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সে সকল নামকে অস্বীকার করা যাবে না।

(খ) তার কোন প্রকার বিকৃতি সাধন করা যাবে না।

(গ) তার অর্থ তথা গুণকে নিষ্ক্রিয় করা যাবে না।

(ঘ) যে নাম প্রমাণিত নয়, সে নাম ধরে তাঁকে ডাকা যাবে না।

যেহেতু এ সব হল, তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করা। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلِلَّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٨٠) سورة الأعراف

"উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাঁকে ডাকো। আর যারা তাঁর নাম সম্বন্ধে বক্রপথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন কর, তাদের কৃতকর্মের ফল তাদেরকে দেওয়া হবে।" (আ'রাফ ঃ ১৮০)

মহান আল্লাহ নূহ ﷺ-এর জাতির ব্যাপারে বলেছেন,

{وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا}

"(নূহ বলল,) এবং ওরা বলে, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করো না অদ্দ, সুওয়া', ইয়াগূষ, ইয়াঊ'ক ও নাস্‌রকে।' (নূহ ঃ ২৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, 'এগুলি তাদের প্রতিমার নাম।'

অথচ সঠিক হল এই পাঁচটিই হল নূহ ﷺ-এর জাতির নেক লোকের নাম। যখন এঁরা মৃত্যুবরণ করলেন, তখন শয়তান তাঁদের ভক্তদেরকে কুমন্ত্রণা দিল যে, তোমরা এঁদের প্রতিমা বানিয়ে নিজেদের ঘরে ও দোকানে স্থাপন কর। যাতে তাঁরা সর্বদা তোমাদের স্মরণে থাকেন এবং তাঁদেরকে খেয়ালে রেখে তোমরাও তাঁদের মত নেক আমল করতে পার। প্রতিমা বানিয়ে যারা রেখেছিল, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের বংশধরকে এই বলে শির্কে পতিত করল যে, 'তোমাদের পূর্বপুরুষেরা তো এঁদের পূজা করত, যাঁদের প্রতিমা তোমাদের বাড়িতে বাড়িতে স্থাপিত রয়েছে।' ফলে তারা এঁদের পূজা করতে আরম্ভ ক'রে দিল। *(বুখারী ঃ ৪৯২০নং, সূরা নূহের তাফসীর পরিচ্ছেদ)*

আসলে মুশরিকরা মূর্তিপূজা করত না, আসলে তারা পূজা করত তাদের নেক লোক বা আউলিয়াদের। যেমন বর্তমান যুগের মুসলিম

নামধারী মুশরিকরাও আসলে নেক লোক বা আউলিয়াদের ইবাদত ক'রে থাকে। যদিও অনেক আউলিয়া প্রকৃতার্থে আওলিয়া নয়; বরং বাউলিয়া। মূর্তিপূজাই হোক বা মাযারপূজা, দুর্গাপূজাই হোক বা দর্গাপূজা, আসলে কিন্তু আসলার্থে বা নকলার্থে মানুষ বা জিনপূজা।

এখান থেকে তাদের ধারণা স্পষ্টতঃ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, যারা মনে করে, কুরআনে মূর্তিপূজা নিষেধ আছে, মাযারপূজা নয়। যেহেতু তারা তাদের ঐ পূজাকে 'যিয়ারত' নামে আখ্যায়িত করে! সুতরাং আল্লাহই সাহায্যস্থল।

ইসরাঈলী বর্ণনা ও ভিত্তিহীন কিছু কেচ্ছা-কাহিনী

এই তফসীরে এমন কিছু কেচ্ছা-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, যার কোন ভিত্তি নেই অথবা যা সহীহ-শুদ্ধ নয় অথবা যা ইসরাঈলী বর্ণনা।

ইসরাঈলী বর্ণনা বলতে উদ্দিষ্ট হল সেই সকল বর্ণনা, যা আহলে কিতাব প্রমুখাৎ বনী ইসরাঈলের নানা ঘটনা বর্ণনা করা হয়, যা তাদের সমাজে প্রচলিত কাহিনী মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত ও তাদের কিতাবে-কিতাবে বর্ণিত করা হয়েছে।

জেনে রাখা দরকার যে, ইসরাঈলী বর্ণনা সাধারণতঃ তিনভাবে এসে থাকে ঃ-

এক ঃ যে বর্ণনার ভিত্তি ইসলামের শরীয়তে আছে বা যার সত্যতা শরীয়তে স্বীকৃত।

এমন বর্ণনা বা কাহিনী আমরা বিশ্বাস করব এবং প্রচারও করব।

দুই ঃ যে বর্ণনার ভিত্তি ইসলামের শরীয়তে নেই বা যার সত্যতা শরীয়তে স্বীকৃত নয় বা যার মিথ্যায়ন করা হয়েছে।

এমন বর্ণনা বা কাহিনী আমরা বিশ্বাস করব না এবং প্রচারও করব না। তবে তা 'বাতিল' বলে মানুষকে সতর্ক করতে হবে।

তিন ঃ যে বর্ণনা বা কাহিনীর ব্যাপারে আমাদের শরীয়তে সত্যায়ন নেই, মিথ্যায়নও নেই।

এমন বর্ণনা বা কাহিনী প্রচলিত হলেও আমরা সত্যজ্ঞান করব না, মিথ্যাজ্ঞানও করব না। কারণ তা সত্য না মিথ্যা তা জানার উপায় আমাদের কাছে নেই।

দ্বিতীয় প্রকার বর্ণনার উদাহরণ স্বরূপ দেখুন সূরা বাক্বারার ১০২নং আয়াতের তফসীর। যাতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ.....} (١٠٢) سورة البقرة

"সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানেরা যা আবৃত্তি করত, তারা তা অনুসরণ করত।"

তফসীরে বলা হয়েছে, 'তাঁর রাজত্ব যখন হাতছাড়া হয়, তখন শয়তানেরা যাদুর সামগ্রী তাঁর সিংহাসনের নিচে দাফন ক'রে রেখেছিল।'

সুলাইমান ﷺ-এর রাজত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনী বিশ্বাস্য নয়। যেহেতু প্রথমতঃ তা ইস্রাঈলী বর্ণনা। আর দ্বিতীয়তঃ মহান আল্লাহ নবীগণকে হিফাযত করেছেন এবং তাঁদের মর্যাদার সাথে এমন কাহিনী সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

দ্বিতীয় উদাহরণ দেখুন ঃ সূরা ইউসুফের ৫২নং আয়াত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} (٥٢)

"এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না।" (ইউসুফ ঃ ৫২)

তফসীরে বলা হয়েছে, 'এ (সাফাই) এ জন্য যে, যাতে সে (আযীয) জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে (তার স্ত্রীর ব্যাপারে) আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।'

উক্ত তফসীর থেকে বুঝা যায় যে, এ কথার বক্তা ছিলেন ইউসুফ ﷺ। অথচ অনেক তফসীরকারকের নিকট এটাও যুলাইখারই উক্তি ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ﷺ-এর অনুপস্থিতিতেও তাকে মিথ্যাভাবে অপবাদ দিয়ে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করব না। বরং আমানতদারীর চাহিদা সামনে রেখেই আমি আমার ভুল স্বীকার করছি। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, আমি আমার স্বামীর খিয়ানত করিনি এবং কোন বড় পাপ ক'রে বসিনি। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, ইবনুল কাইয়েম ও ইবনে কাষীর (রঃ) এই মতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

তৃতীয় উদাহরণ ঃ

{وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ} (٨٣) سورة الكهف

"তারা তোমাকে যুলক্বারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে----।" (কাহফ ঃ ৮৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'তাঁর নাম সেকেন্দার।'

কিন্তু এমন কোন সহী দলীল নেই, যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যুলক্বারনাইনের নাম সেকেন্দার।

যুলক্বারনাইন এর শাব্দিক অর্থ হল দুই শিংবিশিষ্ট। আর তাঁর নামকরণের কারণ ঃ যেহেতু তাঁর মাথায় বাস্তবেই দুটি শিং ছিল। কিংবা কারণ এই যে, তিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে সূর্যের (উদয়-

অস্তের সময় তার) শিং বা কিরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর মাথায় শিঙের মত চুলের দুটি ঝুঁটি ছিল। পূর্ববর্তী মুফাস্সিরগণের মতানুসারে তিনি হলেন রোমের আলেকজান্ডার, যাঁর রাজত্ব ছিল পূর্ব-পশ্চিম বিস্তৃত। কিন্তু আধুনিক যুগের মুফাস্সিরগণ অভিনব ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোকেই তাঁদের সাথে একমত নন। বিশেষ করে মওলানা আবুল কালাম আজাদ, যিনি যুলক্বারনাইনের স্বরূপ ও প্রকৃতত্ব উদ্ঘাটনের জন্য যে গবেষণা করেছেন, তা প্রশংসাযোগ্য।

তাঁর গবেষণার সারমর্ম হল ঃ

(ক) যুলক্বারনাইন সম্বন্ধে কুরআন পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে যে, তিনি এমন এক বাদশাহ ছিলেন, যাকে আল্লাহ প্রচুর পার্থিব উপকরণ ও উপাদান দান করেছিলেন।

(খ) পূর্ব ও পশ্চিমের দেশসমূহকে জয় ক'রে এমন এক পাহাড়ী রাস্তায় পৌঁছলেন, যার অন্য দিকে য়্যা'জূজ-মা'জূজ জাতি বাস করে।

(গ) সেখানে তিনি য়্যা'জূজ-মা'জুজের রাস্তা বন্ধ করার জন্য একটি মজবুত প্রাচীর নির্মাণ করলেন।

(ঘ) তিনি ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী সম্রাট ছিলেন।

(ঙ) তিনি প্রবৃত্তিপূজারী ও ধন-সম্পদের লোভী ছিলেন না।

মওলানা আজাদ বলেন, এই সমস্ত গুণের অধিকারী একমাত্র পারস্যের সেই সম্রাট যাকে ইউনানী (গ্রীস) ভাষায় সাইরাস, ইবরানী (হিব্রু) ভাষায় খুরাস এবং আরবী ভাষায় কাইখাস্রু নামে অভিহিত করা হয়। তাঁর রাজত্বকাল ৫৩৯ খ্রিষ্টপূর্ব। মওলানা আরো বলেন, ১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সাইরাসের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে, যাতে তাঁর দেহকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে, তাঁর শরীরের দু দিকে ঈগলের মত দুটি ডানা এবং ভেড়ার মত মাথায় দুটি শিং রয়েছে। *(বিস্তারিত*

দ্রষ্টব্য ঃ তরজমানুল কুরআন ১ম খন্ড ৩৯৯-৪৩০পৃঃ) আর আল্লাহই ভালো জানেন। *(আহসানুল বায়ান)*

চতুর্থ উদাহরণ ঃ

{حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} (٩٣) سورة الكهف

"চলতে চলতে সে (যুলক্বারনাইন) যখন দুই পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছল---।" (কাহফ ঃ ৯৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, সে পর্বত হল তুর্কী দেশের শেষ প্রান্ত। অথচ এর কোন দলীল নেই।

পঞ্চম উদাহরণ ঃ

{وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ} (٣٤) سورة ص

"আমি সুলাইমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার আসনের উপর রাখলাম একটি দেহ; অতঃপর সুলাইমান (আমার) অভিমুখী হল।" (স্বাদ ঃ ৩৪)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ ولقد فتنا سليمان } ابتليناه بسلب ملكه وذلك لتزوجه بامرأة هواها وكانت تعبد الصنم في داره من غير علمه.

অর্থাৎ, 'আমি তার রাজত্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পরীক্ষা করেছিলাম।' ব্যাপারটা ছিল, তিনি এক মহিলাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সে তাঁর অজান্তে তাঁরই প্রাসাদে মূর্তিপূজা করত!

{ ثم أناب } رجع سليمان إلى ملكه بعد أيام بأن وصل إلى الخاتم فلبسه وجلس على كرسيه.

অর্থাৎ, 'সুলাইমান অভিমুখী হল' মানে তিনি কিছুদিন পর নিজ রাজত্বে ফিরে এলেন। অতঃপর নিজ অঙ্গুরীয় পরিধান ক'রে সিংহাসনে উপবেশন করলেন।

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) যে কাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তাতে সন্দেহ আছে। যেহেতু সে কাহিনীতে রয়েছে উক্ত নবীর মানহানি এবং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মতো লজ্জাজনক ব্যাপার। অথচ মহান আল্লাহ প্রত্যেক নবীর মান-সম্মান রক্ষা করেছেন।

তবে তাঁর এই পরীক্ষা কী ছিল, সিংহাসনে রাখা নিষ্প্রাণ দেহটি কিসের ছিল? তা সিংহাসনে রাখার অর্থ কী? এসব বিবরণ কুরআন পাকে বা কোন সহীহ হাদীসে বিদ্যমান নেই। তবে কোন কোন তফসীরবিদ সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত একটি ঘটনাকে আলোচ্য আয়াতের তফসীর বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনার সারমর্ম হল যে, একবার সুলাইমান ﷺ স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করলেন যে, আজ রাত্রে আমি আমার (৭০ বা ৯০ জন) সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করব, যাতে প্রত্যেকের গর্ভ থেকে এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। কিন্তু এ মনোভাব ব্যক্ত করার সময় তিনি 'ইনশাআল্লাহ' বলতে ভুলে গেলেন। (অর্থাৎ তিনি নিজ তদবীরের উপর পূর্ণ ভরসা ক'রে বসলেন।) যাতে ফল এই দাঁড়ালো যে, স্ত্রীগণের মধ্যে মাত্র একজন গর্ভবতী হলেন এবং তাঁর গর্ভ থেকে একটি মৃত ও অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। নবী ﷺ বলেছেন, "যদি সুলাইমান ﷺ 'ইনশাআল্লাহ' বলতেন, তাহলে তাঁর প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ থেকে (তাঁর আশানুরূপ এক একটি) মুজাহিদ সন্তান ভূমিষ্ঠ হত।" *(বুখারী ২৮১৯, মুসলিম ৪৩৭৫-৪৩৭৯নং)*

এই সকল তফসীরবিদদের মতে সম্ভবতঃ 'ইনশাআল্লাহ' না বলা বা শুধু নিজ তদবীরের উপর ভরসা করাটাই ফিতনা বা পরীক্ষা ছিল, যে ফিতনায় সুলাইমান ﷺ-কে ফেলা হয়েছিল। আর সিংহাসনের উপর নিক্ষিপ্ত দেহ ঐ অসম্পূর্ণ বাচ্চা। আর আল্লাহই ভালো জানেন। *(আহসানুল বায়ান)*

এ ছিল ইসরাঈলী বর্ণনার ভিত্তিতে করা কিছু তফসীরের নমুনা। এই শ্রেণীর তফসীরের অনুরূপ কিছু তফসীর আছে, যা ভিত্তিহীন কাহিনী মাত্র। আর তাতেও আছে নবীর শানে আঘাত করার মতো কথা। যেমন,

{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا} (٣٦)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (আহযাব ঃ ৩৬)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ কিংবা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে (আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিপরীত) ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না।" (এ আয়াত আব্দুল্লাহ বিন জাহশ ও তাঁর বোন যয়নাবের শানে অবতীর্ণ হয়েছে, যখন নবী ﷺ যায়দ বিন হারেসার সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য জয়নাবকে পয়গাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা পূর্বধারণা মতে জেনেছিলেন যে, নবী ﷺ তাঁকে পয়গাম দিয়েছেন নিজের জন্য। তাই তাঁরা এ বিবাহ অপছন্দ করলেন। অতঃপর) "কেউ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য হলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।" (এই

আয়াতের জন্য উভয়ে বিবাহে সম্মত হয়ে গেলেন। সুতরাং নবী ﷺ যায়দের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন। অতঃপর কিছু পরে তাঁর দৃষ্টি যয়নাবের উপর পড়ল। ফলে নবী ﷺ-এর হৃদয়ে তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং যায়দের হৃদয়ে তাঁর প্রতি ঘৃণা স্থান পেল। অতঃপর যায়দ নবী ﷺ-কে বললেন, 'আমি ওকে তালাক দিতে চাই।' তিনি বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না---' যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا } (٣٧) سورة الأحزاب

"স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন; তুমি লোককে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত। অতঃপর যায়েদ যখন তার (স্ত্রী যয়নাবের) সাথে বিবাহ-সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম; যাতে বিশ্বাসীদের পোষ্যপুত্রগণ নিজ স্ত্রীদের সাথে বিবাহসূত্র ছিন্ন করলে সে সব রমণীকে বিবাহ করায় তাদের কোন বিঘ্ন না থাকে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (আহযাব ঃ ৩৭)

"তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন"-এই কথার ব্যাখ্যায় তিনি লিখেছেন, 'তা ছিল যয়নাবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং এই কামনা যে, যায়দ তাকে তালাক দিলে, তিনি তাকে বিবাহ করবেন।

অথচ এ কথা প্রমাণিত নয়। পরন্তু তা বিবেকগ্রাহ্যও নয়। কারণ তা নবুঅতের মর্যাদার পরিপন্থী। বরং সঠিক কথা হল তাই, যা হাসান বিন আলী ﷺ বলেছেন। তিনি বলেছেন,

أن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوج فلما أتاه زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه قال: اتق الله وأمسك عليك زوجك. فقال الله تعالى: قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه.

অর্থাৎ, (যয়নাবের সাথে নবীর বিয়ের আগেই) মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর অন্যতম স্ত্রী হবেন। অতঃপর যখন যায়দ ﷺ তাঁর কাছে নিজ স্ত্রী (যয়নাবের) অভিযোগ নিয়ে এলেন, তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' মহান আল্লাহ বললেন, 'আমি তো তোমাকে খবর দিয়েছি যে, তোমার সাথে আমি তার বিয়ে দেব। আর তুমি তা গোপন করছ, যা আল্লাহ প্রকাশ করছেন।' *(তফসীর ইবনে কাষীর)*

মোটকথা, পালিত পুত্রের স্ত্রীর প্রতি মহানবী ﷺ-এর প্রেম-ভালোবাসার যে গল্প তফসীরের নামে পাওয়া যায়, তা বানানো রূপকথা মাত্র। সঠিক হল, জাহেলী যুগে প্রচলিত পালক-প্রথা বাতিল করার জন্যই মহানবী ﷺ-কে তাঁর পালিতপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিবাহ দেওয়ার কথা মহান আল্লাহ অগ্রিম জানিয়েছিলেন। আর লোকদেরকে

ভয় করার অর্থ হল, তাঁর মনে এই ভয় ছিল যে, লোকেরা বলবে, দেখ মুহাম্মাদ (পালিত) পুত্রবধূকে বিবাহ করল।

ইসরাঈলী বর্ণনা-প্রভাবিত আরো তফসীর দেখুন সূরা স্বাদে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} (٢٠) سورة ص

"আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও বাগ্মিতা।" (স্বাদ ঃ ২০)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) লিখেছেন,

{ وشددنا ملكه } قويناه بالحرس والجنود وكان يحرس محرابه في كل ليلة ثلاثون ألف رجل.

অর্থাৎ, 'প্রহরী ও সৈন্য-সামন্ত দ্বারা তার রাজত্বকে সুদৃঢ় করেছিলাম।' আর প্রত্যেক রাত্রে ত্রিশ হাজার পুরুষ তাঁর মিহরাব (রাজপ্রাসাদ) পাহারা দিত।

তফসীরে কেবল পাহারা ও সৈন্য-সামন্ত দ্বারা দাঊদ ﷺ-এর রাজত্বকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার কথা বলা হয়েছে। অথচ এমন সংখ্যা নিরূপণ করা এবং কেবল সৈন্য-সামন্তের বলে রাজ্য সুদৃঢ় হওয়ার কথা ইসরাঈলী গপ্প ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু একজন নবীর রাজত্ব শক্তিশালী হবে, তাঁর ব্যক্তিত্ব, নবুঅতের মর্যাদা, আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা---এটাই স্বাভাবিক। আর সেই সাথে থাকবে প্রচুর সৈন্য-সামন্ত এবং শত্রুর প্রতি বেপরোয়া হওয়ার সুদৃঢ় মনোবল।

পরন্তু 'ত্রিশ হাজার প্রহরী'র পাহারা দেওয়ার কথাও অকল্পনীয়। তবুও মুসলিমের উচিত, তা মিথ্যায়ন না করা, আর না সত্যায়ন করা।

ত্রিশ হাজার প্রহরী পাহারা সত্ত্বেও কীভাবে বিবদমান দুটি লোক প্রাচীর ডিঙিয়ে তাঁর প্রাসাদে সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছে গেল এবং তিনি ভয় পেয়ে গেলেন? রাতের বেলায় ত্রিশ হাজার লোক যাঁর পাহারায় থাকে, দিনের বেলাও তাঁর কমসে-কম দশ হাজার লোক পাহারায় থাকবে। তাই নয় কি?

মোটকথা, এই শ্রেণীর ইসরাঈলী কেচ্ছা-কাহিনীর ব্যাপারে আমাদেরকে একটি মৌলনীতি মনে রাখতে হবে।

এক ঃ যে কথা আমাদের শরীয়তে বাতিল, তা বাতিল ও অবিশ্বাস্য।

দুই ঃ যে কথা আমাদের শরীয়ত সত্য বলে সাক্ষ্য দেয়, (সহীহভাবে প্রমাণিত) তা সত্য বলে বিশ্বাস্য।

তিন ঃ যে কথার সত্য-মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমাদের শরীয়ত নীরব, সে কথার ব্যাপারে আমরা ভেবে দেখব যে, তা বিবেকগ্রাহ্য ও যুক্তিযুক্ত কি না? যদি তা হয়, তাহলে আমরা তা না সত্য জানব, আর না মিথ্যা জানব। পক্ষান্তরে বিবেকগ্রাহ্য ও যুক্তিযুক্ত না হলে আমরা তা মিথ্যাই জানব। কারণ শরয়ী দলীল না থাকলে বিবেক ও যুক্তির দলীল গ্রহণ অবধার্য।

মহান আল্লাহ দাঊদ ﷺ-এর কাহিনী বর্ণনায় বলেছেন,

তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? যখন ওরা প্রাচীর ডিঙিয়ে উপাসনা-কক্ষে প্রবেশ করল এবং দাউদের নিকট পৌঁছল, তখন সে ভীত হয়ে পড়ল। ওরা বলল, 'ভীত হবেন না, আমরা বিবাদমান দুই ব্যক্তি; আমাদের একে অপরের উপর যুলুম (অত্যাচার) করেছে; অতএব আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করুন; অবিচার করবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন।

{إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ} (২৩) سورة ص

"এ আমার ভাই, এর আছে নিরানব্বইটি দুম্বা, আর আমার আছে একটি; তবুও সে বলে, আমাকে এটি দিয়ে দাও এবং তর্কে সে আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।" (স্বাদ ঃ ২১-২৩)

জালালুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ) দুম্বার ব্যাখ্যায় লিখেছেন 'স্ত্রী'। বলেছেন, আরবীতে এমন প্রয়োগবিধি প্রচলিত আছে।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা কুরআনের স্পষ্টার্থের পরিপন্থী। সুনিশ্চিতভাবে ইসরাঈলী বর্ণনা-প্রভাবিত।

কিন্তু প্রশ্ন থাকে, দাঊদ ﷺ-এর উক্ত কাহিনী যদি মহিলা-সংক্রান্ত ব্যাপার না হয়, তাহলে তওবা ও সিজদা কিসের জন্য ছিল?

দাঊদ ﷺ-এর সে কাজ কী ছিল, যার জন্য তাঁকে ত্রুটি স্বীকার এবং তওবা, ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুতাপ প্রকাশ করার অনুভূতি হল, অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা ক'রে দিলেন?

কুরআন কারীমে এর বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় না এবং কোন সহীহ হাদীসেও এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই। ফলে কোন কোন তফসীরবিদ ইস্রাঈলী বর্ণনার উপর ভিত্তি ক'রে এমনও কথা লিখেছেন, যাতে একজন নবীর মর্যাদাহানি হয়।

কোন কোন তফসীরবিদ; যেমন ইবনে কাষীর (রঃ) এ বিষয়ে এই নীতি অবলম্বন করেছেন যে, যখন কুরআন ও হাদীস এ বিষয়ে চুপ আছে, তখন আমাদেরও এর পিছনে পড়া উচিত নয়।

তফসীরবিদদের এক তৃতীয় দল, যারা উক্ত ঘটনার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন, যাতে কুরআনের অস্পষ্ট বিষয়ের কিছু ব্যাখ্যা হয়ে যায়। এর পরেও তাঁরা কোন এক রকম ব্যাখ্যায় সর্বসম্মত নন। সুতরাং কেউ

কেউ বলেন যে, দাউদ ﷺ কোন এক সৈনিককে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার আদেশ করেছিলেন। এটা ঐ সময়ে কোন দোষের বিষয় ছিল না। দাউদ ﷺ সেই মহিলার গুণাবলী ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতার কথা জানতেন। যার ফলে তাঁর মনে এই ইচ্ছার সঞ্চার হয়েছিল যে, সাধারণ নারী না থেকে তাকে একজন রানী হওয়া দরকার। যাতে তার গুণাবলী ও চারিত্রিক পূর্ণতা দ্বারা পুরো দেশ উপকৃত হতে পারে। এ রকম ইচ্ছা যতই ভাল চিন্তা-ভাবনা নিয়ে করা হোক, কিন্তু প্রথমতঃ একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকা অবস্থায় এ কাজ এক প্রকার অশোভনীয়। দ্বিতীয়তঃ এই কথা বাদশার পক্ষ থেকে প্রকাশ করাতে এক ধরনের চাপ প্রয়োগ করার শামিল ছিল। ফলে দাউদ ﷺ-কে অভিনীত ঘটনা দ্বারা তা অশোভনীয় হওয়ার উপলব্ধি প্রদান করা হল এবং সত্য-সত্যই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন।

অনেকে বলেন, মুকাদ্দামা নিয়ে আগত ব্যক্তিদ্বয় ফিরিশ্তা ছিলেন, যাঁরা একটি কাল্পনিক মুকাদ্দামা নিয়ে এসেছিলেন। এখানে দাউদ ﷺ-এর ভুল এই ছিল যে, তিনি বাদীর কথা শুনেই ফায়সালা ক'রে দিলেন এবং বিবাদীর কথা শোনার প্রয়োজন মনে করলেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য এই রকম পরীক্ষা করলেন। এই ভুল উপলব্ধি করতে পেরেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর পরীক্ষা ছিল। অতএব তিনি আল্লাহর দরবারে মাথা নত করলেন।

অনেকে বলেন যে, আগত ব্যক্তিদ্বয় ফিরিশ্তা নয়, মানুষ ছিল এবং এটা কাল্পনিক ঘটনা নয়, বরং সত্য ঝগড়াই ছিল; যার ফায়সালা নেওয়ার জন্য তারা এসেছিল। এইভাবে তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার

পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। কারণ উক্ত ঘটনাতে অসহনীয় ও ক্রোধ-উদ্রেককর বেশ কিছু আচরণ ছিল।

প্রথম ঃ অনুমতি ছাড়াই প্রাচীর ডিঙিয়ে প্রবেশ করা।

দ্বিতীয় ঃ ইবাদতের বিশেষ সময়ে এসে বাধা সৃষ্টি করা।

তৃতীয় ঃ তাদের ধৃষ্টতাপূর্ণ ভঙ্গিতে কথাবার্তা (অবিচার করবেন না ইত্যাদি) যা তাঁর বিচারীয় মর্যাদার জন্য হানিকর ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেন, ফলে তিনি ক্রোধান্বিত না হয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেন। কিন্তু তার অন্তরে যে প্রকৃতিগত সামান্য বিরাগ সঞ্চার হয়েছিল, তাকেই তিনি আপন ভুল ভেবেছিলেন। যেহেতু এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা ছিল, সেহেতু এরূপ প্রকৃতিগত বিরাগ সঞ্চার না হওয়াই উচিত ছিল। যার জন্য তিনি আল্লাহর দিকে রুজু করেছিলেন এবং ক্ষমা প্রার্থনায় রত হয়েছিলেন। আর আল্লাহই ভালো জানেন। *(আহসানুল বায়ান)*

বড় দুঃখের বিষয় যে, নারী-নেশা পেয়ে বসার বয়সেই মাদ্রাসার ছাত্ররা এই 'জালালাইন শরীফ' অধ্যয়ন ক'রে জানতে পারে যে, দাউদ নবী নারী-প্রেমে পড়েছিলেন। প্রেমে পড়েছিলেন তাঁর পুত্র সুলাইমান নবীও। এমন কি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের নবীও নারী-প্রেমে পড়ে পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন! (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।)

জানি না, উক্ত তফসীরের মুদার্রিসগণ সে ব্যাপারে সতর্ক হয়ে পড়ান কি না? নাকি রুটিন হিসাবে কেবল কোর্স শেষ করেন এবং সহীহ আকীদা ও সঠিক বিশ্বাসের মাথা খেয়ে সঠিক ও শুদ্ধ ইসলাম প্রচারে ব্যর্থ থাকেন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ঈমান ও ইসলামকে ইসরাঈলী বর্ণনা ও আগ্রাসন থেকে ভেজালমুক্ত কর এবং আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে তাহক্বীক্বী চেতনার সুন্দর পরিবেশ তৈরী ক'রে দাও। (আমীন)

পরিশিষ্ট

এ ছিল তফসীরের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির নমুনা। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, তফসীরটির কদর কমে গেল, তা আর পড়া বা পড়ানো যাবে না। বিশাল উপকারিতার মাঝে সামান্য এ বিচ্যুতি দশ শতাংশও নয়। তবে পাঠককে---বিশেষ ক'রে মাদ্রাসার মুদার্রিস ও তালেবে ইল্‌মকে সতর্ক করা জরুরী ছিল, তাই বিষয়টির অবতারণার আবশ্যকতা ছিল।

এই সমীক্ষা পাঠ ক'রে আশা করি তফসীরে যামাখশারী ও কাশ্‌শাফ প্রমুখ তফসীরের ব্যাপারে সকলে সতর্ক হবেন। যেমন সতর্ক হবেন মওলানা আকরাম খানের বাংলা তফসীর পড়ার ব্যাপারে।

গ্রন্থ প্রণয়নে ভুল-ত্রুটি স্বাভাবিক। কেবল মহান আল্লাহই তাঁর অবতীর্ণ গ্রন্থের ব্যাপারে বলেছেন, 'এই সেই গ্রন্থ, যাতে কোন সন্দেহ নেই। যার সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে কোন বাতিল আসতে পারে না।' বাকী মানুষের প্রণয়ন ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়।

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পূর্ববর্তিগণের উপর যেমন গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! এমন ভার আমাদের উপর অর্পণ করো না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের পাপ মোচন কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর। তুমি আমাদের অভিভাবক। অতএব সত্য প্রত্যাখ্যানকারী (কাফের) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে (সাহায্য ও) জয়যুক্ত কর।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)*

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.